চুরি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

চুরি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কোন গল্পের কোথায় শুরু তার কোনও ঠিক নেই। কোথায় শেষ তাও স্পষ্ট করে বলা যায় না। মনে হয় মানুষের সব গল্পেরই শুরু ক্ষীণ— অতি ক্ষীণ সেই আদিম কালে, যখন মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। সেইটেই গল্পের মুখপাত। সব গল্পেরই সূচনা ও সম্ভাবনা বীজাকারে নিহিত ছিল সেই ঘটনার ভিতরেই। মানুষের আবির্ভাব। তাই মানুষের প্রায় সব গল্পই মোটামুটি আদিম ও আরণ্যক, তা যতই তাকে পোশাক পরানো হোক। লোভ, কাম, ভয়, বিস্ময়, ক্ষুধা, অহং নিয়ে মানুষ ও মানুষী জন্মাল— এইটেই গল্প। এক ও অকৃত্রিম। তারপর তার যতেক নির্মাণ, শিল্প, টেকনোলজি, সূক্ষ্ম চিন্তা সবই হল সেই আদিমতার আদুর গায়ে নানা আবরণ দেওয়ার চেষ্টা। সব গল্পেরই শুরু সেইখানে। ইতিহাসের লিপিবদ্ধ আলোকিত কাল পেরিয়ে কিংবদন্তীর আবছায়ার উজানে, গভীরতার কুজ্‌ঝটিকায় কবে এক প্রসূতির কাতরতা আর এক নবজাতকের শিহরিত ক্রন্দনে সেই গল্পের শুরু। আজও বহমান।

এই গল্পের শুরু এক সন্ধেবেলায়। শীতের সন্ধে। ব্যানার্জিদের বাড়ির দোতলার দরদালানে হঠাৎ যদুর ঘুম ভাঙল। প্রায় কিছুই করার নেই বলে সে আজকাল সন্ধেবেলায় ঘুমোয়। বাড়ির কর্ত্রীর এখন-তখন অবস্থা। তিনি নার্সিং হোমে। ছেলেও সেখানে। মৃগাঙ্কবাবু সেই যে বেরিয়েছেন বেড়াতে এখনও ফেরেননি। বোধহয় কালোবাবার থানে অবিচল বিশ্বাস আর ভরসা নিয়ে বসে আছেন কোনো অলৌকিক জরিবুটির আশায়, কিংবা লেকের ধারে বসে থেকে থেকে কালশূন্যতায় পৌঁছে গেছেন, ফেরার কথা মনেই নেই। বাড়িতে এখন যদু একা।

ঘুমটা চট করে ভাঙে না। কলিং বেল বা টেলিফোনের আওয়াজ হলে ভাঙে। নইলে নয়। আজ যে ভাঙল তারও কারণ আছে। এবাড়ির কর্ত্রীর যে অসুখ যদুর বউয়েরও তাই তফাত হল কর্ত্রীর বয়স ষাটের ওপর, যদুর বউ কুসুমের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। দুজনেরই ক্যানসার। কর্ত্রী কলকাতার সবচেয়ে ভাল নার্সিং হোম-এ যত্নআত্তিতে আছেন। কুসুমের চিকিৎসা চলছে গাঁয়ের এক হোমিওপ্যাথের হাতে। তফাতটা আগে চোখে পড়ত না, আজকাল পড়ে। তার তিনটে ছেলের মধ্যে বড় দুটো উচ্ছন্নে গেছে। ছোটোটা এখনও বখে যাওয়ার বয়সে পৌঁছোয়নি। আর এ বাড়ির দুটি ছেলেই রত্ন। এক ছেলে থাকে আমেরিকায়। এক ছেলে এখানে, সেও কেওকেটা। তবে নিজের মেয়ের কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে বটে যদু। মনু শুধু সুন্দরই নয়, মাধ্যমিক পাশ। তাও ফার্স্ট ডিভিশন।

আজই একটা পোস্টকার্ড এসেছে গাঁ থেকে। যদুর মেয়ে মনু লিখেছে, "মায়ের খুব পেটে ব্যথা হচ্ছে। কিচ্ছুটি খেতে পারছে না। বিমল ডাক্তার বলেছে, কলকাতায় নিয়ে যেতে। মা বড্ড রোগাভোগা হয়ে গেছে, তাকানো যায় না। চোখমুখ কেমন ফ্যাকাসে।"

কুসুম মরবে এ তো জানা কথাই। কিন্তু বড্ড কষ্ট পেয়ে মরবে। খুদকুঁড়ো যদুর যা আছে তা সব চলে যাবে কুসুমের চিকিৎসায়। যদুর মনটা আজ বড় অস্থির।

এ বাড়িতে দশ বছর চাকরি করার পর বড়বাবু অবশেষে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। সেও চাকরেরই কাজ। বেয়ারা। ফাইফরমাশ খাটা। মাইনে ছশো টাকা, সব নিয়ে-থুয়ে। বড়বাবুর নিজের মস্ত ফার্ম আছে। ইচ্ছে করলে সেখানে চাকরি দিতে পারতেন। দেননি। কেন দেননি তা জানে না যদু। তার অত জানতে নেই। এখন সে যেটায় কাজ করে সেটা বকলমে বড়বাবুরই বলে সে শুনেছে। কিন্তু কর্তৃত্ব করে অন্য লোক। চাকরিটাই অপয়া, চাকরিও পেল, আর কুসুমেরও রোগটা হল।

কুসুমের দুঃখে যে যদু খুব কাতর এমন নয়। ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হলে তাদের মধ্যে আদর সোহাগের চেয়ে ঝগড়াঝাঁটিই বেশী হয়। তবু যে যদুর আজ কুসুমের ব্যাপারটা মনে লাগছে তার কারণ অপমান। তার মনে হচ্ছে, কেবলই মনে হচ্ছে, এরকমভাবে কুসুমের মরে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। বড্ড অন্যায় হচ্ছে। এ বাড়ির কর্ত্রীর জন্য প্রতিদিন হাজার টাকার মতো খরচ হয়। আর কুসুমের জন্য? কহতব্য নয়। এটাই ভারী অপমান লাগছে তার।

আজকাল যদুর কেন যে অপমান লাগে। আগে তো লাগত না। গত দশ বছর কলকাতায় থেকে এবং এক বড়লোকের বাড়িতে চাকরি করে করে তার এই ব্যাপারটা হয়েছে। সে দশ বছর ধরে তার যা হয়েছে তা হল, সে এখন ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে, টেলিফোনে কথা বলতে পারে, দু-চারটে ইংরিজি কথার মানে জানে, গাড়ি চালাতে পারে ইত্যাদি। আজকাল

নিজেকে চাকর ভাবতে তার ভাল লাগে না।

এ বাড়িতে তার একখানা ঘর আছে। ওপর নীচ মিলিয়ে মোট আটখানা ঘর। কে থাকবে এত ঘরে? একতলার পিছন দিককার একখানা ছোটো ঘরে সে একা থাকে। একটা চৌকি আছে। একটা আলনা। একটা টেবিল-চেয়ারও। কলকাতা শহরে এই ঘরখানার ভাড়া কত হতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়। ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম অবধি আছে।

যদু ঘুম ভেঙে নীচে তার ঘরে নেমে এসে মেয়ের চিঠিটা আবার পড়ল। প্রতি মাসে মাইনের টাকা নিতে আসে তার ছোটো ছেলে পল্টু। পুরো টাকাটাই প্রায় পাঠিয়ে দেয় যদু। তার নিজের হাত খরচের একটু টানাটানি হয় বটে, কিন্তু ওদিককার খরচও তো দেখতে হবে। ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে, খোরাক বাড়ছে, জামাকাপড়ের বহর বাড়ছে। তার ওপর কুসুমের অসুখ। যতদিন অ্যালোপ্যাথী চলছিল, জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছিল টাকা। কাজ হচ্ছিল না বলে হোমিওপ্যাথী চলছে। খরচ কমেছে কিন্তু এবার কুসুমকে একবার কলকাতার ডাক্তার না দেখালেই নয়।

যদুর মাথাটা গরম লাগছে। বড্ড অপমান। একজনের জন্য দিনে হাজার টাকা খরচ, অন্য আর একজনের জন্য...!

যদু পোস্টকার্ডটা তোশকের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। তার মনের মধ্যে আজকাল বড় অস্থিরতা। নানা পাপচিন্তাও আসে। যদু অবশ্য সেসব চিন্তাকে ঠেকিয়ে রাখে।

টেলিফোনের ক্ষীণ শব্দ নিজের ঘর থেকেও শুনতে পেল যদু। তার কান খুব সজাগ।

যদু দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে এসে হলঘরে টেলিফোন ধরল।

কে? যদুদা?

হ্যাঁ।

বাবা কোথায়? বাবাকে একটু দাও তো।

উনি ফেরেননি এখনও।

সুমিত বিরক্তিভরা গলায় বলে, ফেরেননি! তাহলে কোথায় গেল? এই সময়টায় বাবার তো বাড়িতে থাকা উচিত।

কী হয়েছে বলো না!

মায়ের অবস্থা ভীষণ খারাপ। খুব খারাপ। রাতটা হয়তো কাটবে না।

আমাকে যেতে হবে?

তুমি এসে কী করবে? কারও কিছু করার নেই। তবে শেষ সময়ে বাবাকে হয়তো দেখতে-টেখতে চাইতে পারে। বাবারও তো উচিত এসময়ে কাছে থাকা।

মায়ের কি জ্ঞান আছে?

কী করে বলব? ভিতরে তো যেতে দিচ্ছে না এখনও।

তাহলে আর বাবা গিয়ে কী করবেন? দেখা যদি না-ই করতে দেয়?

সুমিত তবু ঝাঁঝালো গলায় বলল, তবু এসময়ে বাবার একবার আসা উচিত ছিল।

এলেই বলব। দরকার হলে আমিই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবো।

সুমিত একটু শব্দ করেই তেজী হাতে টেলিফোন রেখে দিল। রেগেছে। কিন্তু রাগটা অকারণ। এটা ঠিক এখনকার রাগ নয়, পুরোনো রাগ। মৃগাঙ্কবাবু ভীতু মানুষ, অসুখ-বিসুখ মৃত্যু ইত্যাদি সহ্য করতে পারেন না। স্ত্রীর অসুখ ধরা পড়ার পর থেকেই তিনি খানিকটা গৃহবাসী বিবাগীর ভূমিকা নিয়েছেন। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। দীনেশবাবুর বাড়িতে এক সাধুর আখড়ায় বা লেক-এর ধারে গিয়ে বসে থাকেন। লোকটার এইসব দুর্বলতার কথা যদু জানে।

দশ বছর ধরে মৃগাঙ্কবাবুকে বাবা আর কল্পনাদেবীকে মা বলে ডেকে আসছে যদু। ডাকটা ডাকই। তার সঙ্গে ভিতরের কোনও সম্পর্ক নেই। যদু কি এদের কাছে ভালবাসা পায়নি? পেয়েছে। যথেষ্টই পেয়েছে। কিন্তু সেটাও পেয়েছে চাকরেরই মাপে। তাতে দয়া, অনুকম্পা, দাক্ষিণ্য মেশানো। হয়তো সেটাও ঘুষ। এ বাজারে বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড্ড শক্ত। তা বলে দশ বছরে কি একটু মায়াও পড়েনি? পড়েছে। কিন্তু সে তো কুকুর পুষলেও পড়ে।

যদু কতটা বিশ্বাসী? বিচার করে দেখলে যদু নিজেও বুঝতে পারে, সে বেশ বিশ্বাসী। বাজারহাটে যেতে হয় তাকে, গিন্নিমাকে হিসেব দিতে হয়। তাতে দু'চার টাকা এধার-ওধার হয়

।টে, কিন্তু তেমন একটা বড় মাপের চুরির পর্যায়ে পড়ে না। জিনিসপত্র যে বড় একটা সরায়নি কখনও। আসলে এসব দিকে নজর ছিল না যদুর। সে বরাবর ভেবে রেখেছিল, ঠিকমতো কাজ করলে এ বাড়ির বাবা তাকে একটা ভাল চাকরি পাইয়ে দেবেন। চাকরি পেলে সে আর কেন উঞ্ছবৃত্তি করবে? উঞ্ছবৃত্তিটাকে তাই সে প্রথম থেকেই প্রশ্রয় দেয়নি। মৃগাঙ্কবাবুর মেয়ে মঞ্জুলার যখন বিয়ে হল তখন কত গয়না এল। অসতর্কভাবেই রাখা ছিল এদিকে ওদিকে। যদুর মনে চুরির কথা উদয় হয়নি। অবশ্য চুরি করা কঠিনও ছিল। সে দীনেশবাবুর দেশের লোক। আর দীনেশবাবু বড়বাবুর সাঙ্ঘাতিক বন্ধু। এ বাড়িতে তাকে এনে চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন ওই দীনেশকর্তাই। তার বাড়ির ঠিকানা এরা ভালই জানে। তবে সে পালিয়ে যেতে পারত। ফেরার হতে পারত।

ফেরার হওয়ার সম্ভাবনা দেখাও দিয়েছিল যদুর। তবে সে চুরি করে নয়। সামনের বস্তিতে ঝড়ুয়া নামে একটা লোক ছিল, ভাল ইলেকট্রিক মিস্তিরি। এ বাড়ির কাজে সে ছিল বাঁধা লোক। বেশ ভাব হয়েছিল যদুর সঙ্গে। লোকটার দোষ বড্ড মদ খেত। মদ খেতে খেতে একেবারে পাগলা-মাতাল হয়ে যেতে ভালবাসত। তার কাছে ইলেকট্রিকের কাজ শিখছিল যদু, যদি তা থেকে দু-চার টাকা আয় হয়। সেই সূত্রে ঝড়ুয়ার বউয়ের সঙ্গে ভাব হল। অলকা। বছর কুড়ি বাইশ বয়স, মাখো-মাখো চেহারা। ঢলানীও বেশ। অলকার দুঃখ ঝুড়িভরা। মাতাল স্বামীর ঘর করতে গেলে যা হয়। দুঃখের কাঁদুনী গাইতে সে বেছে নিয়েছিল যদুকে। এক একদিন চুপি চুপি তার ঘরে চলে আসত দুপুরবেলা। বসে বসে দুঃখের কথা বলতে থাকত। বলতে বলতে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকত চোখের দিকে। বাক্য হারিয়ে যেত দুজনেরই।

একদিন বলেই ফেলল, তোমার মতো একজনকে পেতাম তো বেশ হত। যা জ্বলে পুড়ে মরছি। তুমি কেমন ভাল। বিড়িটা পর্যন্ত খাও না।

যদুর বুক একটু ছলছলিয়ে উঠল। কেমন যেন গরম হয়ে গেল শরীর। মুখে বলল, ওসব ভেবে আর কী হবে?

কেন হবে না বলো তো! সাহস করলেই হয়, ইচ্ছে করলেই হয়।

কী হয়?

অলকা খুব গম্ভীর করুণ মুখে বলেছিল, ভয় নেই। আমি পালিয়ে গেলে ও থানা-পুলিশ করবে না। বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

যদু সেই যে উচাটন হল, বেশ কয়েকদিন তার ঘাড়ে ভালবাসার ভূতটা গ্যাঁট হয়ে বসে ঠ্যাং দোলাতে লাগল। যখন তখন বুক গুড়গুড় করে উঠত, হাত-পা কাঁপত, রাতে ভাল ঘুম হত না। চল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে জীবন শুরু করার ভারী একটা ইচ্ছে হয়েছিল তার।

ব্যাপারটা যখন বেশ পেকে উঠল তখন একদিন দুপুরে নিজের ঘরে অলকার চোখের জলে ভাসা মুখখানা দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি যদু। জাপটে ধরতে গিয়েছিল। অলকা কিন্তু টপ করে ছাড়িয়ে নিয়ে আতঙ্কের গলায় বলেছিল, না না, ওসব এখন নয়। যতদিন ওর নামে সিঁদুর পরি ততদিন নয়। যদি আমাকে নিয়ে আলাদা করে ঘর বাঁধো তবেই ওসব।

যদু আরও পাগল হল। একদিন বলল, কিন্তু পালাবো যে; খাবো কী বলো তো! চাকরি দেবে কে?

কেন, আমাদের মতো মানুষেরা কি বেঁচে নেই দুনিয়ায়? এখন যা চাকরি করছো তাই করবে অন্য কোথাও। ঠিক জুটে যাবে। ড্রাইভারি জানো, ইলেকট্রিকের কাজ জানো, রান্না জানো, তোমার কি কাজের অভাব? অভাব শুধু সাহসের।

এটাও অপমান। যদুর ভারী অপমান লেগেছিল এ কথায়। তাই সে স্থির করে ফেলল, যা হয় হবে। অলকাকে নিয়ে পালাবে।

এমন মনের অবস্থা হয়েছিল তখন যে, ছেলের মুখের দিকে পর্যন্ত ভাল করে তাকাতে পারত না। তখন বড় ছেলে ঝন্টু টাকা নিতে আসত প্রতিমাসে। পাছে মুখ দেখলে মায়া বাড়ে সেই ভয়ে অন্য দিকে চেয়ে দু-চারটে কথার পরই ছেলেকে বিদেয় করে দিত। তখন কুসুমের কথা ভাবতেই কেমন ভয়-ভয় করত।

তাকে বাঁচিয়ে দিল ঝড়ুয়াই। মদ খেয়ে খেয়ে শরীরের এমন হাল করে ফেলেছিল যে,

একদিন মাঝরাত্তিরে চোখ উল্টে পটল তোলার জো হল। হাসপাতালে কিছুদিন যমে মানুষে টানাটানি চলল। তখন অলকার অন্য মূর্তি। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকত। একটু যখন সামলে উঠল ঝড়ুয়া তখন বস্তির ঘরে নিয়ে এসে মাস দুই টানা সেবা করল। দু মাস বাদে ঝড়ুয়ার চেহারা ফিরল, মদের নেশা ছাড়তে হল প্রাণের দায়ে। তারপর দেখা গেল আমেদুধে মিশে গেছে। ঝড়ুয়া বড় নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ ধরতে লাগল। পয়সা আসতে লাগল ছপ্পড় ফুঁড়ে।

যদুও কি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেনি? এক গভীর অনিশ্চয়তায় ভেসে যাওয়ার আগে নোঙরটি ফেলা গেছে, এই যথেষ্ট।

ঝড়ুয়া নিজেই একদিন মিটিমিটি হেসে যদুকে বলল, বুঝলি যদু, অলকা আর এখানে থাকতে চাইছে না। তার নাকি বস্তিতে পোষাচ্ছে না।

তাই নাকি?

তাই তো বলছে। নষ্ট লোকেরা নাকি তাকে খুব দিক করে। মাতালের বউ তো, সবাই ভাবে বেশ্যা।

যদু রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগল। অপমান!

ঝড়ুয়া একটা শ্বাস ফেলে বলল, অনেকের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে আমরা তাই উঠেই যাচ্ছি।

যাও, জাহান্নামে যাও, আমার কী! বিড়বিড় করে বলেছিল যদু।

ওরা উঠে গেল।

সেই থেকে যদু যদুর মতোই আছে। ওঠা নেই, পড়া নেই, ঘটনা নেই, রোজ একরকম, রোজ একরকম, রোজ একরকম। কাজ করো, খাও, ঘুমোও।

এই গত বছর মৃগাঙ্কবাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে এক মস্ত অফিসে গিয়ে কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে এলেন। এটা হয়তো কয়েক বছর আগেই পারতেন। কিন্তু বাবুদের কারবারই তো ওই। যেটা পারবেন সেটাও করতে গড়িমসি। তা ছাড়া বাড়ির চাকর কাজে গেলে বাবু আর গিন্নীদের অসুবিধেও বটে। কিন্তু চাকরটারও যে চারটে প্রাণীকে খুদকুঁড়োর জোগাড় করে দিতে হয় সেটা ভাবে কে?

জমিজমা বেশী ছিলও না। যা ছিল তাও গেছে আছে শুধু গাঁয়ের বাড়িটা। তাও ট্রেন বাস হাঁটাপথে গহীন কোন রাজ্যে। কালেভদ্রে যেতে হয় যদুকে। আজকাল মনে হয়, রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। শহুরে ভাব যদুকে একটু একটু ধরেছে বটে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ওই অপমানবোধ। কথায় কথায় আজকাল তার ভারী অপমান লাগে।

যদু ফোনটা রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গিন্নীমা তবে চললেন। যাচ্ছেন ভালই। যেতে সবাইকেই হয়। তবে তার মধ্যে কেউ আরামে, কেউ কষ্টে। গিন্নীমা এয়ারকন্ডিশন করা ঘরে শুয়ে, মাথাভর্তি সিঁদুর আর মনে নিশ্চিন্দির ভাব নিয়ে খাবি খাচ্ছেন। কুসুম সেভাবে যাবে না। তাকে রোগে খাবে, অনিশ্চয়তায় খাবে, অভাবে খাবে খানিক, খুবলে খাবে ছেলে আর মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা, স্বামীর ওপর রাগ অভিমান।

যদু চারদিকে তাকাল। তার হাতেই রাজ্যপাট। এ বাড়ির সব খবর তার নখদর্পণে।

বাড়ির কর্ত্রী আর যে ফিরবেন না তা একরকম জানতই যদু। এখন আরও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আজ রাতটাও বোধহয় কাটবে না।

যদু অনেক খবর রাখে এ বাড়ির। কিন্তু যে-খবরটা তার এখন সবচেয়ে জরুরী বলে মনে হল, তা গিন্নীমার জমানো টাকা। লোহার আলমারিতে। শোওয়ার ঘরে, গিন্নিমার তোশকের তলায় চাবি। মেয়েরা জমাতে ভালবাসে। গিন্নীমাও বাসেন। লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজস্ব ধনসম্পদ সঞ্চয় করার মধ্যে আনন্দও হয়তো আছে। কয়েক দফায় গিন্নীমার সঞ্চিত টাকা যদুই গিয়ে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে এসেছে। কখনো-সখনো হাজার দুহাজারও, অনেকদিন হল গিন্নীমার টাকা নিয়ে সে ব্যাংকে যায়নি। টাকাটা ঘরেই আছে। যদু জানে, কোথায় আছে। শোওয়ার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের মস্ত আয়না। তার মুখ বাইরের ঘরের দিকে। একবার নয়, বহুবার বাইরের ঘর থেকে পর্দায় ফাঁক দিয়ে সের আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখেছে, গিন্নীমা আলমারির লকার খুলে একটা বিস্কুটের টিনে টাকা রাখতেন।

রাগ আর অপমান যদুর আজ এত উঁচুতে উঠেছে যে, সে দ্বিধা করল না। তোশকের তলা থেকে চাবি বের করে আলমারি আর লকার খুলল। বিস্কুটের টিনটায় হাত রাখার পর থামল। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? সে হল, যাকে বলে রবি ঠাকুরের "পুরাতন ভৃত্য"। তার পক্ষে কি কাজটা ঠিক হচ্ছে? সে খাটবে পিটবে, হাত তোলা মাইনে নেবে, দেশে তার বউ-বাচ্চা এই মরে কি সেই মরে হয়ে বেঁচে থাকবে, বউয়ের চিকিৎসা টাকার অভাবে হবেই না—তবেই না "পুরাতন ভৃত্য"!

কবিতাটার কথা মনে হতেই গায়ে যেন শুঁয়োপোকা লাগল, সাপের মতো ফোঁস করল সে। শ্বাসবায়ুটা পর্যন্ত আজ জ্বোরো রুগীর মতো গরম।

বাক্সটা খুলে সে টাকাগুলো বের করল। এত টাকা যে হাতের পাঞ্জায় বেড় পায় না। সবই একশ টাকার নোট, অতি দ্রুত টাকাটা গুণে ফেলতে লাগল সে। গুনতিতে কম বেশী হলে ক্ষতি নেই, এ তো আর কাউকে হিসেব দিতে হবে না। এ টাকার কথা জানেন শুধু গিন্নীমা আর সে। আর কেউ নয়। বিয়াল্লিশ হাজার টাকা গুনবার পর তার হাত পা কাঁপতে লাগল।

খালি বিস্কুটের টিনটা যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করল যদু। চাবি জায়গামতো রেখে দিল। তারপর দুড়দাড় করে নেমে এল নিজের ঘরে।

ঘরে কি রাখা উচিত? না। ঘরে রাখা ঠিক হবে না। দৈববশে ধরা পড়তে পারে। তার চেয়ে রান্নাঘরের কাবার্ড ভাল। তালা দেওয়া থাকে।

যদু আবার ওপরে উঠল। কাবার্ড খুলে একটা বড় কৌটোয় টাকা ভরল। শুধু দু' হাজার টাকা সরিয়ে রাখল। কাল পল্টু টাকা নিতে আসবে।

বাবু কখন ফিরবেন তার কোনও ঠিক নেই। বাড়িটা ফাঁকা লাগছে যদুর। কেন এত ফাঁকা লাগছে তা বুঝতে পারছে না। একটু ভয় ভয় করছে। সে গ্যাস উনুন ধরিয়ে চা করে খেল। আজকাল তার যখন তখন চায়ের তেষ্টা পায়।

চা খেতে খেতে মনে হল, বিয়াল্লিশ হাজার টাকা একদিক দিয়ে দেখলে অনেক টাকা, অন্যদিক দিয়ে হিসেব করলে কিছুই নয়। গিন্নীমার জন্য যে-হারে খরচ হচ্ছে কুসুমের জন্য তার চার ভাগের এক ভাগ করলেও এক দুই মাসের মধ্যে টাকাটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। ফলটাই বা হবে কোন কচু? কুসুম তো বাঁচবে না। বরং কুসুমের যেমন চলছে চলুক, যদু যদি গাঁয়ে গিয়ে জমিজমা কিনে চাষবাসে নেমে পড়ে তাহলে একটা কাজের কাজ হয়। কলকাতার উঞ্ছবৃত্তি থেকে তবে সে রেহাই পায়। সে বাড়িতে গিয়ে বসলে ছেলেপুলেগুলো উচ্ছন্নে যায় না।

তবে হ্যাঁ, এসব তাড়াহুড়ো করে করলে হবে না, করতে হবে ধীরে ধীরে। হঠাৎ বড়লোকী দেখালে ধরা পড়ে যাবে, পাঁচকান হবে, লোকে আন্দাজ করবে সে দাঁও-টাও মেরেছে।

চা শেষ করে কাপটা ধুয়ে রাখল যদু। এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল আজ রাতেই। তবে বাড়ির কাজ সে এখনই ছাড়বে না। তাহলে একটা সন্দেহ আসতে পারে। বাইরে যেমন যদু তেমন যদু। তবে ভিতরে ভিতরে যদুই জানবে, এ বাড়ির সঙ্গে তার আর সম্পর্ক নেই।

সামনের বারান্দায় গিয়ে চাদরমুড়ি দিয়ে একটু দাঁড়াল। সামনে এক ফালি বাগানে মেলা গাছপালা। ফটকে আলো জ্বলছে। এ বাড়িতে দারোয়ান নেই, মালী নেই, অন্য কোনো কাজের লোক নেই। একা যদু। যদুই সব, একটা কুকুর ছিল আগে। কয়েক বছর আগে সেটাও মরেছে। তবে একটা সিকিউরিটি এজেন্সীর লোক রাত-পাহারা দিতে আসে। শুধু রাতটুকুই।

যদু ফিরে এল ঘরে। টিভিটা চালাল। আগড়ম বাগড়ম ঙ ক কিছু হয় টিভিতে। আজও হচ্ছিল। দেশের উন্নতি দেখাচ্ছে শালারা। ডকুমেন্টারি। তবু যা হোক, একটা কিছু চললে আর ততটা একা-একা লাগবে না, ভয়-ভয়ও করবে না।

চোখের পলকে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা তার হয়ে গেল, এটা বারবার মনে হচ্ছে আর মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে যদুর। অতগুলো টাকা তার। গিন্নীমার কষ্টে জমানো টাকা এ নয়। এদের ফেলে ছড়িয়ে অনেক আছে। গিন্নীমার হাতে কর্তাবাবু যা সংসারখরচ দেন তা অঢেল, মাসে অন্তত হাজার দু'হাজার জমে যায় তাতে। গিন্নীমার কাউকে হিসেব দিতে হয় না। সুতরাং এই ফালতু টাকাটা চুরি করলে তেমন পাপ হবে না, গরিবেরটা মেরেই তো বড়লোকেরা বড়লোক। সাধুপুরুষ তো আর এরা নয়।

টিভি দেখতে দেখতেই যদু স্থির করে ফেলল, কুসুমের চিকিৎসায় টাকাটা ফুঁকে দেওয়ার কোনও মানেই হয় না, তা বলে সে খুব একটা পাষণ্ডও নয়, যেটুকু না করালে নয় সেটুকু করাবে। বাদবাকী টাকায় সে নিজের সংসারটার ভাঙচুর মেরামত করবে। ভাঙচুর তো কিছু কম হয়নি।

ফোন এল।

বাবা কি এসেছে যদুদা?

না। তবে সময় হয়েছে।

বাবাকে যে ভীষণ দরকার।

এলেই আমি নিয়ে যাবো। গিন্নীমার খবর কী?

ভাল নয়। ডাক্তার বলছে রাত কাটবে না। তবে শেষ চেষ্টা চলছে।

যদু গলাটা করুণ করে নিল। বলল, তুমি কখন থেকে বসে আছো, এক কাজ করো, তুমি বাড়িতে চলে এসো। আমি নার্সিং হোমে গিয়ে বসে থাকি।

তা হয় না। মাকে ছেড়ে এসময়ে আমি যাবো না। তুমি বাবাকে নিয়ে এসো। যত তাড়াতাড়ি হয়।

ঠিক আছে।

।। দুই ।।

আজ অলকার ব্লাউজটাই আঠাকাঠির মতো আটকে রেখেছে মৃগাঙ্কর চোখকে। তিনি যে চোখ ফেরাতে পারছেন না, তা কাম বা মুগ্ধতার জন্য নয়। কত কম কাপড়ে আজকাল ব্লাউজ তৈরি হয় সেটাই বিস্মিত চোখে দেখছিলেন তিনি। হ্যাঁ, মুগ্ধ না হলেও এই নতুন ধরনের ব্যাপারটা তাঁর তেমন খারাপও লাগছিল না। ব্রাসিয়ারের স্ট্র্যাপের সীমানা ধরে ধরে কাটা ব্লাউজের ভিতর দিয়ে যে শরীর চিত্রিত হয়ে আছে তা এক রমরমা যুবতীর। তাঁর নিজের বয়স তেষট্টি হলেও কিছু যায় আসে না। অলকার শরীরের আক্রমণ তাঁকেও বিব্রত করে।

আর বিব্রত হতেই তো আসা।

অলকা কিছু বলে যাচ্ছিল। তিনি হুঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অলকার সব কথা না শুনলেও চলে। বড্ড বেশি বকে মেয়েটা। বেশির ভাগ কথাই দুঃখের। অভাবের। চাহিদার। কিছু লোক থাকে যারা জীবনের দুঃখের দিকটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। অলকা এদের দলের মুখপাত্র হতে পারে। ও কি জানে যারা এত কথা বলে এবং এত ঝুড়িভরা দুঃখ যাদের, তাদের শেষঅবধি সেক্স অ্যাপীল থাকে না? অথচ অলকা দেখতে বেশ। মাজা রং, মাঝারি লম্বা, রোগা বা মোটা নয়, দাঁত উঁচু নয়, চোখ টানা টানা, গাল পুরন্ত, ঠোঁট টসটসে। বয়স কত আর হবে? মেরেকেটে ছাব্বিশ বা সাতাশ।

পেস মেকার কথাটা বার কয়েক শুনতে পেলেন মৃগাঙ্ক। বাকীটা শোনার দরকার নেই। অলকার বাবার অসুখ। হার্টের। পেসমেকার বসাতে হবে। এটাই এই শীতের সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে বলছে অলকা। সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে হাসপাতালের বিবরণ, জনৈক ডাক্তারের ভুলভ্রান্তি, অফিসের লোন পাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধে, আত্মীয়দের হৃদয়হীনতা ইত্যাদি। আসল কথাটাই অবশ্য বলছে না। সেটা ঠারেঠোরে জানাচ্ছে মাত্র।

মৃগাঙ্ক তাই আনমনে অলকার ব্লাউজটাই দেখছিলেন। ব্লাউজ যে ঢাকনা সেটাই যেন এই ব্লাউজটা বিদ্রোহের সঙ্গে অস্বীকার করছে। যা ঢেকে রাখার কথা তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে ব্লাউজের গুণে। কিন্তু কাম বা লোভ কিছুই আজ বোধ করতে পারছিলেন না মৃগাঙ্ক। তাঁর স্ত্রীর অবস্থা এখন তখন। বাড়ি ফিরেই হয়তো দুঃসংবাদ পাবেন। তাই বাড়িও ফিরছেন না তিনি, সময় কাটাচ্ছেন। এসময়ে কাম থাকে না। সময়টা কাটানোই এখন বেশী জরুরী।

কল্পনা এখন মৃত্যুর দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বিকেলে নার্সিং হোমে ফোন করেছিলেন। তখনও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অফিস থেকে গিয়ে নার্সিং হোমে পৌছোয়নি। নার্সিং হোম থেকে জানাল, কন্ডিশন ভাল নয়। বাড়ির লোকের যাওয়া দরকার।

মৃগাঙ্ক যাননি। নার্সিং হোমের বদলে তিনি এইখানে এসেছেন।

কল্পনা এখন কত দূর এগিয়েছে? পালতোলা একটা নৌকো ক্রমে ভেসে যাচ্ছে বারদরিয়ায়।

মাস্তুল ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে।

আপনার কী হয়েছে বলুন তো! কেমন অস্থির।

মৃগাঙ্ক স্থির হয়ে গেলেন। বললেন, কিছু নয়।

আপনার স্ত্রীরও তো খুব অসুখ, না? বাঁচবেন কি?

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, না।

ক্যানসার তো! বলে অলকা যেন একটু ভাবল। বোধহয় ভাবল, এই অবস্থায় মৃগাঙ্ককে টাকাটার কথা বলা উচিত হবে কি না। ভেবেই বোধহয় বলে উঠতে পারল না।

প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর মৃগাঙ্কবাবুর কাছে। সারাক্ষণ যে-সত্যটা মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে তা নিয়ে কেউ কথা তুললে কাঁটাটা যেন নাড়া খেয়ে তীব্র ব্যথাকে ঘুলিয়ে তোলে। ব্যথাটাকে ভুলবার জন্যই দীনেশের এই চিড়িয়াখানায় আসা। ঘুলিয়ে তোলার জন্য তো নয়।

বড়লোকের ব্যাচেলর ছেলে হলে যা হয় দীনেশ তাই। ক্ষ্যাপা, বাধাবন্ধহারা, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল এবং বায়ুগ্রস্ত। লেক রোডের এই বিশাল বাড়িতে সে যে কত লোককে এনে জুটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পাগল, সাধু, হাফ গেরস্ত সবই আছে। আছে কয়েক ঘর ভাড়াটিয়াও। সে মদ খায়, রেস খেলে, আবার একাদশীও পালন করে, বেড়ায়। ব্যবসা, চাকরি, ঠিকাদারী, দালালী সে বিস্তর করেছে। খামোখাই করেছে। সময় কাটানো ছাড়া এ সবের প্রয়োজন ছিল না এই যে সব লোকজন এনে সে জোটায় এর মূলেও আছে সময় কাটানো। যাদের জোটায় তাদেরও সে বেশীদিন সইতে পারে না, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। অন্তত জনা দশেক সাধু এবং বাবার কাছে সে দীক্ষা নিয়েছে। দীক্ষা নিয়েই সে আপ্লুত হয়ে পড়ে, গুরুকে ধরেবেঁধে এনে নিজের সবচেয়ে ভাল ঘরখানায় রাখে। তারপর পদসেবা, চরণামৃত পান, ভোগের এলাহী ব্যবস্থা। কিছুদিন বাদে কোন গূঢ় কারণে চটেমটে গিয়ে গুরুকেও পথ দেখতে বলে। সম্প্রতি সে কালোবাবার কাছে দীক্ষা নিয়েছে। তাঁকে এনে তুলেছেও এ বাড়িতে। কালোবাবার বয়স বেশী নয়। ত্রিশের মধ্যেই বা এদিক ওদিক। দাড়িগোঁফ কামানো ছিপছিপে গম্ভীর মানুষ। একটু বিষণ্ণ। একটু যেন লাজুকও। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার এত গল্প শুনেছেন মৃগাঙ্ক যে, একটা দুশো পাতার বই লেখা যায়। একটাও বিশ্বাস করেননি; যদিও বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু দীনেশের সব গুরুই যে প্রথম-প্রথম সাঙ্ঘাতিক অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসেন, পরে জোচ্চোর ভণ্ড ইত্যাদি হয়ে দাঁড়ান, মৃগাঙ্ক আর কী করবেন?

অলকা উঠে গিয়ে ফিরে এসে বলল, কালোবাবা এখনও আসনে বসেননি।

কী করছেন? বাথরুমে নাকি?

হ্যাঁ, বাথরুমে ওঁর অনেকক্ষণ সময় লাগে। ধৌত করেন তো।

মৃগাঙ্ক চুপচাপ বসে রইলেন। কালোবাবার কাছে তিনি স্ত্রীর জন্য ওষুধ চেয়েছিলেন। কালোবাবা তার জবাব দেননি। অবশ্য মৃগাঙ্ক এখন আর কালোবাবার ওপর নির্ভর করছেন না। কল্পনা এখন বহু দূর ভেসে গেছে। চোখের আড়ালে।

সোফাসেট দিয়ে সাজানো এই ঘরে আধুনিক ইলেকট্রিকের ঝাড় ঝুলছে। উপরন্তু জ্বলছে দুটো স্টিক লাইট। এত আলোর দরকার ছিলো না। বেশী আলো ভাল লাগছে না মৃগাঙ্কর। তবে অলকাকে বেশ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নানা দিক থেকে আলো পড়ায়।

টিভি দেখবেন মৃগাঙ্কবাবু? আপনার মনটা বেশ খারাপ, টিভি দেখলে ভাল লাগবে।

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, না, আমি এবার উঠব।

দশ মিনিট অপেক্ষা করুন না। উনি বেরোলেন বলে।

আচ্ছা বসছি। দশ মিনিটে কিছু যাবে আসবে না।

খুব ভাবছেন আপনি বউদির জন্য! স্বামীরা কিরকম ভাবে বলুন তো বউয়ের জন্য! আমারই শুধু ভাবার কেউ নেই। এই সময়ে অন্তত একটা স্বামী থাকলে বুকের জোর হত। কী দৌড়ঝাঁপ যে করতে হচ্ছে আমাকে! একা আমাকে।

তোমার আর কেউ নেই?

মা আছেন। মাও হার্টের রুগী। প্রেশারও ভীষণ হাই।

ভাইটাই?

অলকা একটু হাসল, আপনি কিছু মনে রাখতে পারেন না। বলেছি না, আমরা তিন বোন, ভাই নেই।

বলেছো নাকি? আমার মনে থাকে না।

গরিবের কথা কারই বা মনে থাকে বলুন! বলে অলকা একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

তোমার বিয়েটা ভাঙল কেন বলো তো?

বিয়ে তো ভাঙেনি এখনো। সেপারেশন চলছে।

তাই বা কেন?

ও মা, বলিনি আপনাকে? আপনার কিছু মনে থাকে না। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ে হয়েছিল। পাত্র ভাল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি, পরিবারও খারাপ নয়। দাবীদাওয়া তেমন কিছু ছিল না। সব ঠিক। কিন্তু বিয়ের পরই আসল চেহারা বোঝা যেতে লাগল। ননদ, দেওর, শ্বশুর, শাশুড়ি সব এককাট্টা আর আমি একা। প্রথমেই গয়নাগুলো নিয়ে নিল শাশুড়ি, নিয়ে নিজের লকারে পুরল। আমার চাকরির বেতন সবটাই তুলে দিতে হত তাঁর হাতে। তারপর শুরু হল শাসন, এর সঙ্গে মিশবে না, ওর সঙ্গে কথা বলবে না, রেডিও চালাবে না, বাথরুমে গুনগুন করে গান গাইবে না, সিনেমা থিয়েটারে বেশী যাওয়া চলবে না, চুল বব করতে পারবে না, ভ্রূ প্লাক করতে পারবে না.....

মৃগাঙ্ক ফের হুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর চোখ আবার ব্লাউজের দিকে। অলকার গল্পটা তাঁর বিশ্বাস হল না। এদের এরকম গল্প থাকে।

কী দেখছেন অমন করে বলু তো!

মৃগাঙ্কর লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। অলকার সর্বাঙ্গ-নিরাবরণ সর্বাঙ্গ তিনি বারকয়েক দেখেছেন। বললেই পারতেন দেখছি-; কিন্তু হঠাৎ এখন লজ্জা করল তাঁর। সে কি কল্পনা মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গেছে বলে?

মৃগাঙ্ক যতদূর জানেন, দীনেশের হাঁপানী নেই। কিন্তু দীনেশের শ্বাসের শব্দ বহু দূর থেকেই পাওয়া যায়। ওটা ওর এক মুদ্রাদোষ। জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে নিতে ও ভালবাসে। আজ শ্বাসের সঙ্গে কিছু অস্ফুট কটুকাটব্যও চলছে। তা সেটাও অস্বাভাবিক নয়। কাকে যেন গালাগাল দিতে দিতে ঘরে ঢুকল দীনেশ, সব কটাকে জুতিয়ে তাড়াবো, যত সব নিমকহারামের দল, পিচাশ, বদমাশ....

দীনেশের পোশাক নানারকম। আজ সে ঢোলা পায়জামার ওপর গরম পাঞ্জাবি আর তার ওপর একটা জহরকোট চাপিয়েছে। বেশ মোটাসোটা আর বেঁটে। তার চেহারায় একটা গুণ্ডা গুণ্ডা ভাব আছে। বহুবার লম্বা দাড়ি রেখেছে সে। আবার পট করে কামিয়েও ফেলেছে। ইদানীং রাখছে আবার। কাঁচায় পাকায় জম্বুবান দাড়িতে তাকে একটু ভয়ংকরই দেখায়। পোশাকে দাড়িতে ঝাঁকরা চুলে একটা চটকদার ব্যাপার থাকে বলে দীনেশের বয়সটা কেউ খেয়াল করে না। মৃগাঙ্ক আর দীনেশ ইনজিনিয়ারিং কলেজের সহপাঠী ছিলেন শিবপুরে। পরে বিলেতে গিয়ে রুমমেট। একসঙ্গে তারা অনেক কাজ আর অকাজ করেছেন।

দীনেশ সোফায় ভারী শরীরটা ছেড়ে দিলেন ধপ করে। নরম সোফা কোঁক দিল। শীতকালেও দীনেশের একটু ঘাম হয়। দীনেশ মৃগাঙ্কর দিকে কূট চোখে চেয়ে থেকে বললেন, কতক্ষণ হল এসেছিস?

অনেকক্ষণ। সময়ের হিসেব নেই।

এখন থেকে হিসেব কর। আয়ু ফুরিয়ে আসছে। সময়ের এখন খুব হিসেব নিকেশ চাই। এই ছুঁড়িটাকে বেশী প্রশ্রয় দিস না। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে। আর বড্ড খাঁই।

অলকা সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁঝে উঠল, ইঃ, মিথ্যে কথা! কখন কোন মিথ্যে কথাটা বলেছি বলুন তো! আর খাঁই! লজ্জাও যে করে না আপনার মুখে ওকথা আনতে। কতবার করে বলছি এ যাত্রাটা উদ্ধার করে দিন। একটা পেস মেকারের দাম.....

দীনেশ হাত তুলে বললেন, ব্যস, আর কথা নয়। পেস মেকারের ব্যাপারটা আজকাল সবাই জানে। তুমিও কোথাও শুনে থাকবে। ও রাস্তা ছাড়ো অলকা।

ছিঃ ছিঃ, আমি কি বাবার কথাটাও বানিয়ে বলছি? কেউ বলে বুঝি?

বিস্তর লোক বলে। আজকাল মিথ্যে কথা কারও মুখেই আটকায় না। তোমার বাবা-টাবা নেই।

অলকা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দীনেশকে জরিপ করে নিচ্ছিল, কোথায় খবরটা পেলেন?

আমার মেলা গোয়েন্দা আছে জানো না? ওসব বাবা-টাবা আর পেস মেকার-টেকার ছাড়ো। যা রেট তা ঠিকই পাবে। দু চারশো বেশীই দেবো। তা বলে ঠকিয়ে নিতে চেষ্টা কোরো না।

এ মা, আমি কি ওরকম নাকি? বলে অলকা একটু কান্নার ভান করল।

বরের সঙ্গে সেপারেশনের গপ্পোটাও বানানো। সব জানি। গল্পগুলোকে অত করুণ করে তোলো কেন? দেখছো তো, মৃগাঙ্কর মেজাজটা ভাল নেই। তার ওপর করুণরস ছাড়লে কারও ভাল লাগে? সবসময়ে ফুর্তির কথা বলতে হয়। এতকাল লাইনে নেমেছো এখনও এসব বেসিক ব্যাপার শিখলে না!

অলকা নতমুখ হয়ে বসে রইল।

পারেও বটে দীনেশ। মুখের ওপর এসব কথা বলতে ওর কখনো আটকায় না।

দীনেশ কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে অনেকটা অর্ধধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল। তারপর অলকার দিকে চেয়ে বলল, যাও তো, কালোবাবা আসনে বসেছেন কি না দেখে এসো।

অলকা পালিয়ে বাঁচল।

দীনেশ নিমীলিত নয়নে উল্টোদিকের দেয়ালে চেয়ে রইল। সেখানে একজোড়া তলোয়ার ক্রস করা, ওটরে একটা ঢাল। আসল জিনিস, বোধহয় রাজস্থান থেকে কিনে এনেছিল।

দীনেশ সবই জানে। তাই কল্পনার খবরটা মৃগাঙ্ক আর দীনেশকে শোনাতে চাইলেন না, সে স্ফুর্তিবাজ লোক, রোগ শোক মৃত্যুর কথা শুনতে ভালবাসে না। দীনেশ হাসপাতাল, নার্সিং হোম এবং শ্মশান খুব অপছন্দ করে। পারতপক্ষে যায় না। নিজেই বলে, আমি হলুম বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেউ না।

মৃগাঙ্ক এসব ব্যাপারে বরাবরই ডাকাবুকো। বিস্তর মড়া পুড়িয়েছেন, রোগ ভোগ দেখলে কাতর হন না, কিন্তু কল্পনার ঘটনাটা তাঁকে পেড়ে ফেলেছে। এই একটি ক্ষেত্রে তিনি আজকাল দীনেশের মতোই স্পর্শকাতর। দীনেশ অনেকক্ষণ ঢাল তলোয়ারের দিকে চেয়ে আছে দেখে মৃগাঙ্ক বললেন, পেস মেকারের ব্যাপারটা তাহলে.....?

দীনেশ মাথাটা খুব সামান্য মৃগাঙ্কর দিকে ঘুরিয়ে বললেন, সত্যি। পেস মেকার দরকার। তবে ওর বাবার জন্য নয়। বরের জন্য।

বলিস কি?

যারা মিথ্যে কথা বলে তাদের নানা সমস্যা। ওই যে স্বামীর সঙ্গে সেপারেশনের গপ্পো ফেঁদে বসেছিল প্রথম দিন, তাতে আমার সিমপ্যাথী ড্র করল বটে, কিন্তু সামাল দিতে পারল না। এখন স্বামীর পেস মেকার দরকার হওয়ায় একটা বাপ খাড়া করতে হচ্ছে। মাগীকে তাড়াতে হবে। এসব ন্যাকড়াবাজ আমার চলবে না।

মৃগাঙ্ক এসব কথায় অভ্যস্ত। দীনেশ ওরকমই। কথার কোনও আগল নেই। মৃগাঙ্ক জানেন, যা বলছে তা ও করবেও। অলকাকে জুটিয়েছে ও মাস দেড় দুই হল। যথেষ্ট। তিন চার মাসের বেশী ও কাউকে রাখে না। মেয়েমানুষের প্রতি ওর কোনও ভাবপ্রবণতা নেই, প্রেম ভালবাসা দুর্বলতা বলেও কিছু নেই। ইচ্ছেমতো ধরে আর ছাড়ে।

মৃগাঙ্ক তা নন। দেশেবিদেশে তিনি বিস্তর মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। কাঁচা বয়সে যেমন, পাকা বয়সেও তেমন। এই যে অলকা নামে মেয়েটি, এর মুখখানা তাঁর ভারী পছন্দ। ভিতরে ভিতরে অলকার জন্য ভারী টান হয়েছে মৃগাঙ্কর।

মৃগাঙ্ক মৃদু স্বরে বললেন, আজ আমাকে উঠতে হবে রে। সবই তো জানিস।

দীনেশ জবাব দিলেন না। নিমীলিত নেত্রে চেয়েই রইলেন ঢাল আর তলোয়ারের দিকে। হঠাৎ বললেন, টাকাটা ওকে দিবি নাকি?

কোন টাকা?

পেস মেকারের টাকা। ও তো তোকে জপাচ্ছিল।

পাগল নাকি? টাকা দিতে যাবো কেন? আমি কি এত বোকা?

দীনেশ তেমনি অবিচল বসে নির্বিকারভাবে বললেন, পারলে কিছু দিস। আমিও দেবো কিছু। পেস মেকারটা দরকার ঠিকই। মিথ্যে কথা বললেও দরকার। বাবার না হয় তো স্বামীর।

দেখলে তো অবস্থা খুব খারাপ বলে মনে হয় না। চাকরিও তো করে।

চাকরি না ইয়ে। পেটে ক' ফোঁটা বিদ্যে আছে যে চাকরি করবে? ওরকম বলে। আসল চাকরি শরীরের।

স্বামী কী করে?

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। আয় ভালই ছিল। এখন শরীর খারাপ হওয়ায় বসার জোগাড়।

এ সময়ে একটা ছোকরা এসে ঘরে ঢুকল। সুব্রত। মৃগাঙ্ক ছেলেটিকে বারকয়েক দেখেছেন। উঠতি আর্টিস্ট। তবে ছবির বাজারে তেমন পাত্তা পাচ্ছে না। দীনেশ হয়তো ওর জন্যেও কিছু করবে। সকলের জন্যই দীনেশের কিছু করা বা করার চেষ্টা আছে।

অলকা এসে পর্দা সরিয়ে থমথমে মুখে বলল, কালোবাবা আপনাকে ডাকছেন মৃগাঙ্কবাবু।

মৃগাঙ্ক উঠলেন।

ভিতরে করিডোরের দুধারে দু'সারি ঘর। তারপর বেশ বড় এবং সাজানো একখানা ঘরে কালোবাবার অধিষ্ঠান।

মানুষটি কালোই। ছিপছিপে চেহারা। বেঁটে পায়ার এক মস্ত চৌকিতে বিছানায় বসা। দেখে মনে হয়, কালোবাবা নিরন্তর একটা অস্বস্তিতে আছেন। মুখচোখ বিমর্ষ, হাস্যহীন। চোখে কি ভয়?

মৃগাঙ্ক মেঝের ওপর পরিষ্কার কার্পেটে বসলেন।

কালোবাবার পরনে ধুতি, গায়ে একখানা এন্ডির চাদর। নিজের করতলের দিকে ঝুঁকে চেয়ে ছিলেন। মৃগাঙ্ক বসবার পর মুখটা তুলে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ওষুধ কিন্তু আমি জানি না বাবু। দীনেশবাবা লোক ডেকে আনেন। কত কত লোক। সবাই এসে কত কী বলে। সারিয়ে দাও, হইয়ে দাও, পাইয়ে দাও। আমি কি অত পারি? দীনেশবাবাকে কত বলি, শোনে না।

মৃগাঙ্ক কালোবাবার দিকে চেয়ে রইলেন। লোকটাকে তাঁর বিশ্বাস হয় না ঠিকই, কিন্তু অপছন্দও হয় না। লোকটা আজ অবধি তাঁকে ভড়কি দেওয়ার চেষ্টা করেনি। মৃগাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আর আমার চাওয়ার কিছু নেই। আমার স্ত্রী বাঁচবেন না।

কালোবাবার মুখে আন্তরিক একটু বেদনার ছাপ পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওষুধ জানলে আমি দিতাম বাবু। জানি না। তবে ক'দিন খুব ঠাকুরকে ডেকেছি। তাতে যদি কিছু হয়। কিন্তু শক্তি নষ্ট করে ফেললাম যে, আর কি কাজ হবে?

শক্তি নষ্ট হল কীভাবে?

এসব করতে নেই। আমার কি গুরু হওয়ার কথা? দীনেশবাবা মোটেই কানে তুললেন না আমার কথা। বললেন, তুমিই ঠিক লোক, দীক্ষা দাও।

ও আপনাকে খুব বিশ্বাস করে।

ওই তো হয়েছে মুশকিল।

কিসের মুশকিল?

উনি বড় অবুঝ।

তা অবশ্য ঠিক। আমি কিন্তু আর ওষুধ চাই না। যা হওয়ার হয়ে গেছে।

আপনি বুঝদার মানুষ। মানুষ বড় ম্যাজিকট্যাজিক দেখতে চায়। ভোজবাজি চায়। উল্টোপাল্টা সব কাণ্ডমাণ্ড দেখতে চায়। নইলেই বলবে জোচ্চোর, ভণ্ড। তা বাবু, আপনার স্ত্রীর এখন কী অবস্থা?

ভাল নয়। এখন-তখন।

এবার বাবু, তাহলে তাঁর কাছে একবারটি যান। এ সময়ে কাছে থাকতে হয়।

খুব ম্লান একটু হাসলেন মৃগাঙ্ক। তারপর বললেন, বুকের জোর পাচ্ছি না যে।

কালোবাবা করুণ চোখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, জোর পাচ্ছেন না?

না। একদম জোর পাচ্ছি না। তাই তো এখানে এসে পালিয়ে আছি।

কালোবাবা ভারী স্নিগ্ধ নরম গলায় বললেন, তাহলে থাকুন। বসে থাকুন। বসে বসে ঠাকুরকে ডাকুন। বুকের জোর তিনিই দেবেন।

কোন ঠাকুরকে ডাকবো? আমার তো কোনও ঠাকুর নেই। কালী, দুর্গা, শিব, নারায়ণ কাউকেই মনে পড়ে না।

আপনি কি বাবু, নাস্তিক?

তাও তো জানি না। মাথাই ঘামাইনি কখনও।

কালোবাবা একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, দীনেশবাবারও ওই রকম। আস্তিক না নাস্তিক বোঝা যায় না।

কেন, দীনেশ তো খুব ভক্ত।

তাই কি মনে হয়? দীক্ষা নিলেন, আবার মদও খাচ্ছেন, মেয়েমানুষও চলছে। চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি। আবার 'বাবা বাবা' করে কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। বাবু, এসব কী বলুন, তো।

কী বলব বলুন। দীনেশ ওরকমই।

কালোবাবা ভারী উদাস মুখ করে অন্য দিকে চেয়ে বললেন, বাবু, একটা কথা বলব আপনাকে? দীনেশবাবাকে বলুন, আমার এখানে পোষাচ্ছে না। আমার ভিতরটা বড় চমকে গেছে।

তাহলে কী করবেন?

আমি এখানে থাকব না।

তাহলে কোথায় যাবেন?

আমার কোথাও কোনও ঠিক নেই বাবু। ঠাকুরের নাম গান করে বেড়াতাম, বাঁধা জায়গা ছিল না। এ বড় বেঁধে ফেলেছে আমাকে।

আপনার বাড়ি ঘরদোর নেই?

সকলের কি থাকে?

একটা পরিবার তো থাকে, একটা বাড়ি, বা মেটে ঘর, মা বাপ।

আমার অত সব ছিল না। বৈমাত্র দাদা আছে। সে দেখে না। বাপ মা গেছে অনেকদিন। জমিজিরেত সেও তেমন কিছু নয়।

বুঝেছি। অনেকেই অভাবে সাধু হয়।

যে আজ্ঞে। আমিও তেমনই। দীনেশবাবা বড় ভুল লোককে ধরেছেন।

ওকে দীক্ষা দিতে গেলেনই বা কেন?

ও বাবা, ছাড়ে নাকি? দীক্ষা দীক্ষা করে কাছা টেনে খুলে ফেলেন আর কি! শেষে নিজের গুরুমন্ত্রই ওঁর কানেও দিয়ে দিলাম বাবু। কে জানে পাপ হল কিনা। হলে হয়েছে। কী আর করা।

এসব কথা তো আপনি দীনেশকেও স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারেন। তাহলে মোহটা কেটে যায়।

আরও বাড়ে। উনি ওসব কথাকে বিনয় বলে ধরছেন। আমি বড় চমকে আছি বাবু, বড় ঘেবড়ে আছি। আপনি তো বুঝদার মানুষ। ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। যেন ছেড়ে দেয় আমাকে।

মৃগাঙ্ক লোকটার দিকে চেয়ে ভারী একটা আকর্ষণ অনুভব করছেন। কেন করছেন তা বুঝতে পারছেন না। বললেন, আমারও কিন্তু আপনাকে বেশ ভাল লাগে। আমি বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু সরল আর ভাল লোককে আমার ভাল লাগে।

কালোবাবা মৃদু স্বরে বললেন, বোকা সাদা লোক, বাবু। দুঃখী লোক। তা দুঃখী লোককে ভাল লাগতে পারে। ভগবান ওটুকুই দেন দুঃখীদের।

তাই হয়তো হবে। আপনি তো বেশ সুন্দর করে কথা বলেন।

কালোবাবা প্রশংসাটা গায়ে মাখলেন না। হঠাৎ মৃগাঙ্কবাবুর দিকে চেয়ে চাপা গলায় বললেন, ওই মেয়েছেলেটা কে বাবু?

কোন মেয়েছেলে?

ওই যে অলকা। আপনাদের রাখা মেয়েমানুষ নাকি ও?

মৃগাঙ্ক একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, কেন বলুন তো!

দীনেশবাবাই বোধহয় ওকে মাঝে মাঝে রাতের দিকে এ ঘরে লেলিয়ে দেন।

মৃগাঙ্ক সামান্য চমকে উঠে বললেন, সে কী?

কালোবাবা ব্যথিত মুখ করে বললেন, হয়তো আমাকে পরীক্ষা করেন। কাজটা ভাল করেন না। যদি গুরু বলেই মেনে থাকেন তবে নিজের ভোগের জিনিস কেউ কি গুরুকে দেয়? আমরা তো ভাবতে পারি না।

মৃগাঙ্ক সামান্য কৌতূহলী হয়ে বলেন, অলকা কখন আসে?

মাঝ রাত্তিরে। রোজ নয়। দু দিন এসেছিল।

এসে কী করে?

পরীক্ষা করে বাবু। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কালোবাবা। তারপর অন্য একরকম দুঃখী গলায় বললেন, আমিও রক্তমাংসের মানুষ বাবু, শরীর আছে, শরীরের যা যা লাগে সবই আছে।

মৃগাঙ্ক দ্বিধার গলায় বললেন, আপনি কি অলকাকে-?

কালোবাবা জিব কেটে বললেন, না বাবু, ছিঃ। আমাকে এখনও ওই বাঘে খায়নি। একটা কথা বলব বাবু?

কী কথা?

আপনি বড্ড দেরী করছেন।

কিসের দেরী? আমি তো ইচ্ছে করেই দেরী করছি।

সময়মতো যে পৌছোতে পারবেন না।

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, এই সময়টায় আমি কাছে যেতে চাই না। অলকার কথাটা বলুন।

বলার তেমন কিছু নেই। মেয়েমানুষটা রাতবিরেতে আসে, নানা দুঃখের কথা বলে, কাঁদে, নানারকম ছলা কলা করে।

আর আপনি কী করেন তখন?

আমার তখন ভারী দুঃখ হয়, চোখে জল আসে।

কেন, দুঃখ কিসের? অলকা যা চায় দিলেই তো পারেন। ওতে দুঃখের কী আছে?

দীনেশবাবাও ওই কথাই বলেন। তাই কি হয় বাবু? সবাই ভেসে গেলে কি দুনিয়া চলত? চন্দ্র সূর্য উঠত? ওরকমধারা হয় না।

আমরা কি খুব পাপী? আপনার কী মনে হয়?

ও বাবা, আপনারা কেমন তা বিচার করি এমন বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই বাবু। বড্ড ঘেবড়ে আছি, কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি এবার যান বাবু, ওদিকটা দেখুন। সব দিকই দেখতে হয়।

মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, টেনশনটা আমার সহ্য হয় না। যদি মারা গিয়ে থাকে তো গেছে। ভালই। কিন্তু যদি ঝুলে থাকে, যদি আরও দু দিন চারদিন বেঁচে থাকে তো আবার টেনশন। ওই টেনশনটাই আমি সইতে পারি না।

জানি বাবু। আপনার মনটা ক'দিন ধরেই উচাটন। তা বাবু, এক কাজ করলে হয় না?

কী কাজ?

আমি না হয় আপনার সঙ্গে যাই।

যাবেন? বলে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন মৃগাঙ্ক। বিপদে আপদে কালোবাবার মতো একজন সরল সাদা লোক সঙ্গে থাকলে মৃগাঙ্ক বাস্তবিকই জোর পাবেন।

কিন্তু দীনেশ কি যেতে দেবে আপনাকে?

কালোবাবা মাথা নেড়ে বললেন, বলতে কইতে গেলে দেবে না।

তাহলে?

কালোবাবা মৃদু হেসে বললেন, বেরিয়ে পড়লেই হয়।

শাসনবাবু, একটু শুনবেন?

শাসন দাঁড়াল। জানালায় ম্লানমুখী কিশোরীটি আজও দাঁড়িয়ে। ছবিটা ভারী সুন্দর। রাঙচিতার বেড়ার ওপর দিয়ে সোনালতা বেয়ে বেয়ে গেছে। দু'ধারে দুটি ঝুমকো জবার ঘন ঝোপ। মাঝখানে জানালাটি । ভারী দীনদরিদ্র চেহারা বাড়িটির। তবু এই জানালাটিতে কিশোরীর মুখখানা ভাল দেখায়।

শাসন ভট্টাচার্য আগর ঠেলে উঠোনে ঢুকল। শেষবেলার আলো এখনো একটু পড়ে আছে উঠোনে। এখুনি পাট ওঠাবে।

মনু দাওয়ায় বেরিয়ে এল। চোখে উৎকণ্ঠা, গলায় উদ্বেগ।

মায়ের শরীরটা আজ বড়ই খারাপ শাসনবাবু। কী হবে?

আজ কি বড়ই বাড়াবাড়ি?

কিছু খেতে পারছে না। বমি হয়ে যাচ্ছে।

হলধরকে খবর দিতে হইবে কি?

তার ওষুধ তো খাচ্ছে। কাজ হচ্ছে কই? আপনি একটু দেখুন।

চল, দেখি।

শাসন দেখল। কুসুমকে এখনও যুবতীই বলা চলে। বয়স খুব বেশী না। কিন্তু চেহারাটা সিঁটিয়ে সাদাটে মেরে একেবারেই বুড়িয়ে গেছে। চোখ বোজা। ঝিম মেরে আছে।

শাসন মুখখানা দেখল। মাথা নেড়ে বলল, কিছু তো ইতরবিশেষ দেখিতেছি না। একই রকম।

না, আজ খুব খারাপ। আমি তো সব সময়ে মায়ের কাছে থাকি। আমি জানি।

শাসন মেয়েটির দিকে তাকাল। মুখে শ্রী আছে, বুদ্ধির ছাপ আছে, শাসন শুনেছে মেয়েটি লেখাপড়াতেও ভাল। মাধ্যমিক পাশ, কিন্তু তারপর আর লেখাপড়া এগোচ্ছে না। ভাইগুলো তেমন মানুষ না। বাপ কলকাতায়। কী করে কে জানে!

শাসন জানে কুসুমের অবস্থা দিন দিন খারাপই হবে। সে লক্ষণ চেনে। মুখে বলল, অত নিবিড়ভাবে রোগীকে লক্ষ করিবার প্রয়োজন কী? মাঝে মাঝে ঘরের বাহির হইও। সাদা বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া ভাল।

মনু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আপনি সেই যে পাতার রস খাইয়েছিলেন তাতে মা অনেকটা ভাল ছিল কয়েক দিন। দেবেন আর একবার?

শাসন গোপনে একটা বড় শ্বাস মোচন করে বলল, দিব। অবশ্যই দিব। তবে তোমার মায়ের জন্য অত চিন্তা করিও না।

কথাবার্তার শব্দেই বোধহয় কুসুম তার দুর্বল চোখের পাতা মেলে চাইল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, বামুনঠাকুর!

আজ্ঞা করুন।

মাঝে মাঝে যাতায়াতের পথে এ বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন। এ গাঁয়ে আর তো বামুন নেই।

যে আজ্ঞে। তাহাই হইবে।

কুসুম আবার চোখ বুজল। বলল, মনুকে বুঝিয়ে বলবেন, আমার শীতলামায়ের চরণামৃত হলেই হবে। আর ওষুধের দরকার নেই।

শাসন বেরিয়ে এল। সঙ্গে মনু।

শাসনবাবু, আমার খুব বিশ্বাস আপনার ওষুধেই কাজ হবে।

আমি তো ধন্বন্তরী নহি। তোমার মায়ের কী অসুখ তা কি তুমি জানো?

জানি। ক্যানসার।

তাহা হইলে? ইহার আরোগ্য বিশ্বাসের বিষয় নহে, বিজ্ঞানের বিষয়।

মনুর ডাগর চোখ দুটিতে জল টলটল করতে লাগল, আমি তো ভাবি শাসনবাবু সব রোগ ভাল করতে পারেন।

অন্যায় আশাকে মনে প্রশ্রয় দিও না। বরং নিজের দিকে একটু তাকাও।

নিজের দিকে! নিজের দিকে তাকানোর কী আছে?

শুনিয়াছি তুমি লেখাপড়ায় ভাল। তবে উহা ছাড়িলে কেন?

ভাল না ছাই। শচীনদা পড়াতো বলে মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম। আর আমার কিছু হবে না। শচীনদাই চলে গেলেন।

শচীন কে?

শচীন সরকার। স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন। তখন আপনি আসেননি। উনি আমার পড়াশুনোয় মাথা দেখে নিজে আলাদা করে পড়াতেন।

শচীনবাবু কোথায় গেলেন?

রঘুনাথপুরে নতুন কলেজে চাকরি পেয়ে চলে গেল তো গত বছর।

তাহাতে কী হইল? শচীনবাবু না থাকিলে তোমার পড়া হইবে না কেন?

মনু মাথা নেড়ে বলল, হবে না। শচীন স্যারের জন্যই পাশ করেছি। নইলে আমার সাধ্যিই ছিল না।

শাসন হাসল। সে এই ঘটনার মধ্যে একটু অন্যরকম গন্ধ পেয়ে বলল, শচীনবাবুর বয়স কত?

মনু একটু চকিত হয়ে বলল, কত আর! পঁচিশটঁচিশ হবে হয়তো।

তিনি কি এই গ্রামের লোক নন?

না। রঘুনাথপুরেই বাড়ি।

স্থানটি কত দূর?

অনেক দূর। বামনহাটির কাছে।

শচীনবাবু কি তোমাকে চিঠিপত্র দেন?

মনু মুখ নত করে বলল, একটা দিয়েছিল। তারপর আর দেয়নি।

শাসন সামান্য দ্বিধার পর বলল, আমার সামান্য কিছু বিদ্যা আছে। যদি পড়িতে চাও তবে আমিও তোমাকে সাহায্য করিতে পারি। এই স্থানে আমার তো তেমন কোনও কাজ নাই। পড়িবে?

আমি পড়লে মাকে দেখবে কে? হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল তো সেই বিষ্টুপুরে। বাসে যেতে-আসতে হবে। রোজ খরচও তো কম নয়। বইপত্রের টাকাও অনেক।

সমস্যা তো আছেই। সমস্যাই যদি মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলিত তাহা হইলে মানুষ আর এত দূর অগ্রসর হইতে পারিত না। সমস্যা অতিক্রম করিবার চেষ্টার নামই বাঁচিয়া থাকা।

আমার আর পড়ার মনটাই নেই।

শাসন মাথা নেড়ে বলল, বুঝিয়াছি। শচীনবাবু ছাড়া আর বোধহয় ইচ্ছাটা জাগিবেও না। কী আর করা!

এ কথায় মনু ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলল, তা কেন! আমার মনটাই—

শাসন বাধা দিয়ে বলল, তাহা না হয় হইল। কিন্তু দিনরাত্রি রোগী আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিলেই তো চলিবে না।

দিনরাত তো বসে থাকি না। আর মাও সব সময়ে শুয়ে থাকে না। শরীর একটু ভাল বোধ করলেই ওঠে, রান্নাবান্না, ঘরের কাজ সব করে।

যদি রঘুনাথপুরের দিকে যাই তাহা হইলে শচীনবাবুকে কিছু বলিব কি? বলিব কি, যে, মনু লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে?

মনু ঠোঁট উল্টে বলল, আমাকে ওঁর মনেই নেই। কত ছাত্রছাত্রী জুটেছে এখন।

শাসনের মনটা করুণ হয়ে গেল। বেচারা। নেপথ্যের কে এক শচীনবাবু এই কচি মেয়েটার জীবনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে। শচীনবাবু নিজেও বোধহয় জানে না।

তুমি কি শচীনবাবুকে চিঠিপত্র দিয়া থাকো?

মনু মাথা নেড়ে লজ্জায় মরে গিয়ে বলল, এখন আর দিই না। আগে কয়েকটা লিখেছিলাম।

সেই পাষণ্ড কি জবাব দেয় না?

মনু মাথা নাড়ল, দেয় না।

চিঠিতে তাহাকে তুমি কী লিখিয়াছিলে?

কি আর লিখব। এই গাঁয়ের কথা, লেখাপড়ার কথা।

শাসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হৃদয়বৃত্তির জন্য মানুষের কত সময় ও শক্তির অপচয় হয়, কত মানুষ নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলে।

মনু একটু অবাক হয়ে বলল, হৃদয়বৃত্তিটা কী জিনিস শাসনবাবু?

উহা নিরাকার বটে, কিন্তু ব্রহ্মের মতোই শক্তিমান। যাহা হউক, শচীনবাবুর ব্যাপারে কিছু করিতে হইলে বলিও।

মনু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, কিছু করতে হবে না। আপনি আমার মায়ের ওষুধ দিন।

শাসন বেরিয়ে আসবার মুখেই আগল ঠেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পল্টু ঢুকল। সে এ বাড়ির ছোট ছেলে, এখনও বালক।

ঢুকে উত্তেজিত গলায় পল্টু ডাকল, দিদি!

কী রে?

সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!

কী কাণ্ড?

পল্টু সভয়ে শাসনের দিকে চাইল। শাসন বুঝতে পারল, তার সামনে বলতে বাধা আছে। সে একটু ইতস্তত করে বেরিয়ে এল। কিন্তু গাছপালার আড়াল থেকে সে শুনতে পেল যেটুকু শোনার।

পল্টু উত্তেজিত গলায় বলছে, বাবা আজ অনেক অনেক টাকা দিয়ে দিয়েছে। ভাবতে পারবি না।

কত টাকা?

দু হাজার—

বলিস কি রে?

দু হাজার। গুণে দেখ-

চুপ চুপ। কেউ শুনতে পেলে ...ঘরে আয়...

শাসন মেটে রাস্তাটায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দু হাজার টাকা! বাস্তবিকই অনেক টাকা। কিন্তু সংবাদটা তার ভাল মনে হচ্ছে না। এত টাকা এর বাবা কোথায় পেল? যদি বা কোনওভাবে পেয়েই থাকে তবু ওটুকু ছেলের হাত দিয়ে অত টাকা পাঠানো ঠিক হয়নি। তার ওপর এই গ্রাম মোটেই ভাল জায়গা নয়। টাকার গন্ধ পেলেই রাতে ডাকাত পড়বে। গাঁয়েগঞ্জে দু হাজার টাকা এখনও অনেক টাকা।

শাসন ধীর পায়ে মেটে পথটা ধরে এগোতে লাগল। আলো মরে এসেছে। গাছগাছালির ঘন ছায়ায় জোনাকি জ্বলতে লেগেছে। ধোঁয়াটে কুয়াশার ভূতুড়ে আবরণে চরাচর ডেকে যাচ্ছে ক্রমে।

এখানে শাসনের মন বসে গেছে। গাছপালা খুব আছে, পুকুর আছে অনেকগুলো, মাঠঘাট আছে, পুরোনো বাড়িঘর মন্দির আছে। শুধু লোকগুলোই ভাল নয়। মাস চারেক আগে যখন দীনেশবাবু তাকে এখানে পাঠালেন তখন এখানে পা দিয়েই সে টের পেয়েছিল এরা লোক ভাল নয়। কপালের গুণে শাসনকে বরাবর এই ভাল নয় লোকের কাছাকাছিই বসবাস করতে হয়েছে। শাসন লোক চেনে। সে দীনেশবাবুদের ভদ্রাসনে ডেরা বাঁধতেই শেয়ালের মতো সব উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছিল। মুখপাত হিসেবে প্রথম দিনই চুরি গেল তার চটিজোড়া। তার দুদিন পর গেল পেতলের ঘটি। তার তিন দিন পর গেঞ্জী আর গামছা। তারপর তেলের শিশি। তারপর মুরুব্বি মাতব্বররা আসতে শুরু করল।

তা দীনেশবাবুর লোক বুঝি আপনি? বেশ বেশ। ব্রাহ্মণ দেখছি। আগে কোথায় থাকা হত? কলকাতারই লোক বুঝি? নয়? বেশ ভাল। দীনেশবাবুর মতলবখানা কী বলুন তো? নিজেরা যদি না-ই থাকবেন তো দান খয়রাত করে দিলেই তো হয়। ছেলেদের ক্লাব হতে পারে, পঞ্চায়েতের অফিস হতে পারে। এত বড় একখানা বাড়ি খামোখা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

শাসন খুব বিনয়ের সঙ্গেই জবাব দিত। তবে বেশী মাখামাখির মধ্যে যেত না।

এরপর আসতে শুরু করল মতলববাজেরা।

তা দাদার কি করা হত আগে? বউ বাচ্চা সব কোথা? বউ মরে গেছে? আহা, দুঃখের কথা। আর একটা বিয়ে করলেই তো হয়। এ গাঁয়ে মেয়ের অভাব নেই। দীনেশবাবু দিচ্ছে-থুচ্ছে কেমন?

এরপর যারা আসতে থাকল তারাই মারাত্মক। বেশী কথাটথা তারা বলে না, ঘরে ঢুকে পড়ে বিনা অনুমতিতে। তারপর অন্ধিসন্ধি দেখে, জিনিসপত্র ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করে এবং চাপা গলায় খিস্তিখেউড় করে।

শাসন লক্ষ করেছে, এ গাঁয়ের কিছু লোক যখন তখন দৌড়োয়। কেন দৌড়োয় তা সে বুঝতে পারত না। কিন্তু গম্ভীর মুখ করে ঊর্ধশ্বাসে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে দৌড়-চক্কর দিতে থাকে। আর কাছেপিঠে কোথাও দুমদাম বোমা বন্দুকের শব্দ হয় মাঝে মাঝেই।

জানতে বেশী দেরী হয়নি শাসনের। এদের কাজই রাতে ডাকাতি আর দিকে ধান্ধাবাজি।

ধাতস্থ হতে কয়েক মাস সময় লেগেছে শাসনের। সে সাধুভাষায় কথা বলে, তার পৈতে ধপধপ করে, সে গম্ভীর এবং গালগল্প ভালবাসে না, সে রাগে না, তার মদ মেয়েমানুষের দোষ নেই। এই সব কারণে লোকে তাকে তেমন আর খোঁচাখুঁচি করত না। চুরিটাও বন্ধ হয়ে গেল। মাস কয়েকের মধ্যেই শাসনের কাছে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য আসা-যাওয়া শুরু হল মানুষের।

এই একটা কাজ শাসন ভালই পারে। জমিজমা সংক্রান্ত আইনকানুন তার প্রায় নখদর্পণে। বেআইনও তার অনেক জানা।

একদিন সতীশ নামে একটা পাজি লোক তাকে বলল, তুমি কেমনধারা লোক হে? মদ খাও না, মেয়েমানুষের দোষ নেই, গানবাজনা করো না, অন্য ফূর্তি নেই, তোমার সময় কাটে কী করে? বয়স তো চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশী নয় বলেই মনে হয়। বলি তুমি স্পাইটাই নও তো! তোমার লক্ষণ ভাল ঠেকে না।

শাসন মৃদু হেসে বলল, আপনি আমাকে এত লক্ষ করেন কেন? আপনার অন্য কর্ম নাই?

বাঃ, লক্ষ করব কেন? চোখে পড়ে তাই বলছি। তুমি বেশ অদ্ভুত লোক বাবা।

না মহাশয়, অদ্ভুত আর সকলে। আর আমোদ-প্রমোদের কথা বলিতেছেন! সকলের আমোদ-প্রমোদ এক প্রকার নহে। চারিদিকে সৃষ্টির এই যে বৈচিত্র্য দেখিতেছেন ইহা লইয়াই আমার সময় বেশ কাটিয়া যায়। জীবনে কত কী ভাবিবার আছে, বুঝিবার আছে, দেখিবার আছে। অন্য আমোদ-প্রমোদের আবশ্যক কী? আমার তো সময় কাটাইতে কোনও সমস্যা হয় না।

সতীশ হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, তবু বলি তুমি একটু কেমন যেন। দীনেশবাবুর সঙ্গে জুটলেই বা কী করে?

তেমন কিছু ব্যাপার নহে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতাম। অর্থাভাবে পদব্রজেই ভ্রমণ করিতে হইত। নবদ্বীপ ধামে কিছুকাল অবস্থান করিতেছিলাম। তখন অন্ন সংস্থানের নিমিত্ত একটি মন্দির প্রাঙ্গণের সন্নিকটে বসিয়া সন্ধ্যায় গীতা ভাগবত ইত্যাদি পাঠ করিতাম। সেই সময়েই আলাপ। তিনি আমাকে কলিকাতায় নিজ বাটিতে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি সম্মত হই নাই। তখন তিনি আমাকে কহিলেন যে, তাঁহার দেশের বাড়ির চৌকিদার মরিয়াছে। রক্ষণাবেক্ষণের কেহই নাই। আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে এখানে বসবাস করিতে পারি। এই হইল কাহিনী।

আর ওই বিটকেল ভাষায় যে কথা বলো তার রহস্যটা কী?

শাসন হেসে বলল, আমার পিতামহ দেবভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তাহাতে নাকি রসনা অপবিত্র হয়। আমার পিতামহীর সঙ্গে প্রেমালাপও সম্ভবত তিনি দেবভাষাতেই করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশ ছিল এই বংশের উত্তর পুরুষেরা দেবভাষাতেই কথা কহিবে। কিন্তু আমার পিতাঠাকুর সেই নির্দেশ পালন করিতে পারেন নাই। তবে দেবভাষার পরিবর্তে সাধুভাষায় কথা কহিতেন। আমিও সেই অভ্যাস বজায় রাখিয়াছি মাত্র।

এই জবাবে যে সতীশের ধাঁধা কেটে গেল তা নয়। তবে মেনে নিল মাত্র। শাসন সম্পর্কে এই ধাঁধা ও রহস্যময়তা এখনও এ গাঁয়ের লোকের কাটেনি। সন্দেহও আছে। তবে তাকে আর

কেউ তেমন ঘাঁটায় না।

এই ঝুঁঝকো অন্ধকারে শীতের মধ্যে গাছপালার ভিতর দিয়ে পথ পেরোতে পেরোতে শাসন কেবল মনুদের কথা ভাবছিল। অত টাকা ওর বাবা কোথায় পেল? টাকার গন্ধ পেলে ওদের বিপদ ঘটতে দেরী হবে না। এ গাঁয়ের লোক ভাল নয়।

প্রাচীন মন্দির, ধ্বংসাবশেষ, সন্দেহজনক ঢিবি ইত্যাদি সন্ধান করা শাসনের পুরোনো বাতিক। অনেকদিনের পেশাও বটে। এক দুপুরে সে মাইল চারেক দূরে একটা ঢিবি দেখে ফিরছিল। একটা ঘাসবনের ধারে আসতেই শুনতে পেল একটা মেয়েছেলে চেঁচিয়ে গালাগাল করে কার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে।

শাসন মেয়েটির বিপর্যস্ত অবস্থা লক্ষ করল। শাড়িটাড়ির ঠিক নেই, মুখে রাগ। বয়সও বেশী নয়। ত্রিশ-বত্রিশ। যেটুকু শুনল, তা উদ্বেগজনক। মেয়েটি ঘাস কাটছিল। দুটি লোক কোত্থেকে এসে চড়াও হয়ে যা করবার করে চলে গেছে।

ব্যাপারটা নতুন নয়। গাঁয়েগঞ্জে মাঠেঘাটে যে সব মেয়েকে কাজ করতে হয় তাদের এই বিপদ আছেই। এ গাঁয়েও এরকম প্রায়ই হয়। কিন্তু বিপদ হল, ধর্ষণকারী দুজনই শাসনের খুব চেনা। একজন মনুর দাদা মন্টু, অন্যজন গাঁয়ের দৌড়বাজদের একজন। দৌড়বাজ মানেই হচ্ছে ডাকাত বা হবু ডাকাত। তারা দুড়দাড় করে দৌড়ে দৌড়ে শরীর পোক্ত রাখে। নানা কসরতও করে।

বাড়িতে ঢুকতেই শাসন দেখতে পেল, বাইরের বাঁধানো চাতালে একজন লোক দাঁড়িয়ে। প্যান্ট শার্ট সোয়েটার পরা লোক। দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। সিগারেট জিনিসটা শাসন দু চোখে দেখতে পারে না। লোকটাকে দেখে সে উৎসাহ বা বিনয় কিছুই দেখাল না। এমন কি একটিও কথা না বলে ঘরে ঢুকে হারিকেন জ্বালাল।

দীনেশবাবুদের বাড়িটি বেশ বড়সড়, অবস্থাপন্ন পরিবারের সাক্ষ্য দেয়। এক রকম জমিদারই ছিলেন বোধহয়। বাড়িটা একতলা হলেও দশ বারোখানা মস্ত ঘর, সামনে পিছনে টানা লম্বা দরদালান আছে। চারদিক বাগানে ঘেরা। একটা পুকুরও ছিল, এখন মজে এসেছে। শাসন থাকে সামনের মস্ত দরদালানে। একখানা চৌকি ছিলই। তারই ওপরে তার শতরঞ্চি আর চাদর পাতা বিছানা। দড়িতে সামান্য জামাকাপড়। একদিকে তার হাঁড়িকুড়ি। শাসনের হারিকেনের আলো দরদালানটাকে পুরোটা আলোকিত করতে পারে না, অনেকটাই অন্ধকার থেকে যায়।

লোকটা দরজায় এসে দাঁড়াল, আজও জুতো ছেড়ে ঢুকতে হবে নাকি শাসনবাবু, এই শীতেও?

প্রত্যহই হইবে। আমার পাদুকাও বাহিরেই থাকে।

যদি চুরি হয়ে যায়? আড়াই শো টাকার জুতো। আপনার এখানে তো ভীষণ চোর ছ্যাঁচড়।

তাহা আছে। তবে চুরি হইবে না। আপনি বসুন, আমি হাত পা ধুইয়া আসি।

কুয়োর পাথুরে ঠাণ্ডা জলে শাসন হাত-মুখ ধুল। তারপর নীরবে দরদালানে ঢুকে একধারে একটা ছেঁড়া কম্বলের টুকরো মেঝেয় পেতে আহ্নিক করতে লাগল।

লোকটা বসে বসে মশা মারছে। লোকটি ভাল নয়, আবার তেমন খারাপও বলা যায় না। ওই এক রকম। দীনেশবাবু লোকটিকে পছন্দ করেন না। কিন্তু লোকটা এখানে আসে। প্রায়ই আসে।

শাসন আহ্নিক করে উঠতেই লোকটা বলল, সাতগড়ের ঢিবিটায় কিছু নেই। খামোখা খোঁড়ালাম। পয়সা গেল।

শাসন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, মহাশয়, যে কাজে নামিয়াছেন তাহাতে অপচয় অবশ্যম্ভাবী। তবে আপনার যা ব্যবসা তাহাতে পোষাইয়া যাইবে।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, এটাকে ব্যবসা বলাটা ভুল। এ হচ্ছে লটারি খেলা। কত পয়সা গচ্চা দিয়ে তবে একটু কিছু পাওয়া যায়। তাও খদ্দের মেলে না। পুলিসের ভয় আছে। এটা কী একটা ব্যবসা হল মশাই?

তাহার আমি কী করিব? আমি তো আপনাকে ব্যবসাতে নামাই নাই।

লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তা বটে।

কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে একটা নীরবতার বলয় সৃষ্টি হল। তার মধ্যেই শাসন লোকটিকে খর দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল। লোকটা ঘুরে ঘুরে নানা কিউরিওর জিনিস কেনে আর শাঁসালো খদ্দেরকে বেচে। পুরাদ্রব্য আর প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ বা চুরিই লোকটির আসল ব্যবসা। চুরি নিজে করে না, পয়সা দিয়ে অন্যের মাধ্যমে করায়। সুযোগমতো কিনেও নেয়। এই লোকটাকে লোভ দেখিয়ে সাতগড়ের ঢিবিটা খুঁড়িয়েছিল শাসন। কিছুই হয়তো পায়নি, আর পেয়ে থাকলেও কবুল করবে না।

লোকটা এবার আরও একটু নরম স্বরে বলল, কিছু একটা সন্ধান দিন। আমার মক্কেল কলকাতায় বসে আছে। আর আমার মতো আরও বহু দালাল ঘোরাঘুরি করছে। সাবেক ঘড়ি, ঘটিবাটি, পুরোনো বন্দুক, গয়না, মূর্তিটুর্তি যা হোক সে নেবে।

আপনি কি টাকা আনিয়াছেন?

কত টাকা?

তিন হাজার।

না। সঙ্গে অত নেই।

তবে কল্য তিন হাজার টাকা লইয়া আসিবেন। একটা দ্রব্য দিব।

লোকটা একটু দ্বিধা করল, জিনিসটা কী একবার দেখতে পাই না?

শাসন দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, ঠকিবেন না।

ওদিককার খদ্দের কত দর দেয় সেটাই তো ভাবনার বিষয়।

আপনি দশ হাজার হাঁকাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিবেন।

সে কিন্তু পাকা জহুরী, মাল চেনে, আজেবাজে জিনিস গছিয়ে দিলেই হবে না।

শাসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনার অসুবিধা কী জানেন মনীশবাবু? জিনিসটার কত মূল্য তাহা আপনি নির্ধারণ করেন না, করে আপনার খদ্দের। লাভ লোকসানের নিরিখেই আপনার কাছে জিনিসের দাম। কিন্তু সাবেক জিনিসের ইতিহাস ও শিল্পসৌন্দর্যের দামটা আপনার চোখে ধরা পড়ে না। আমরা দুজনেই তস্কর, কিন্তু আপনার সহিত আমার তফাত আছে।

মনীশ আর একবার অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আপনাকে তা বলে অবিশ্বাস করছি না। তবে সাতগড়ের ঢিবিটা খোঁড়াতে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে গেল তো।

কিছুই পান নাই?

না পাওয়ার মতোই। গোটা কয়েক ধাতুমূর্তি। খুব পুরোনো নয়।

আবিষ্কারের আনন্দ পান নাই?

আনন্দ! বলে মনীশ শাসনের দিকে চেয়ে একটু হাসল, আমি সত্যিই ব্যবসাদার শাসনবাবু। আপনার মতো আনন্দের কারবারী তো নই।

যাহা পাইয়াছেন তাহাতে ঠকিবেন না। কিন্তু যদি সেইসঙ্গে আনন্দও পাইতেন তাহা হইলে আনন্দের যোগে লাভ অনেক গুণ হইত। আপনি ইতিপূর্বে খননকার্য করিয়াছেন কি?

মনীশ মাথা নাড়ল, না, ইনিশিয়াল অত টাকা ক্যাপিট্যাল নেই। তা ছাড়া ধরা পড়লে জেল হবে।

খননকার্যের আলাদা আনন্দ আছে। রোমাঞ্চও আছে। জিনিসগুলি আমাকে একবার দেখাইয়া লইবেন।

দেখাবো। এখন ধোয়ামোছা চলছে। কাল সকালে দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আর ওই সঙ্গে আপনার জিনিসটাও নিয়ে যাবো।

শাসন মৃদু স্বরে বলল, তিন হাজার টাকা আনিবেন।

আনবো। জিনিসটা কী তা বলতে বাধা আছে নাকি?

শাসন একটু হাসল। তারপর বলল, একটি পুরাতন শিবলিঙ্গ। অনুমান সাত শত বৎসরের পুরাতন। বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিবলিঙ্গে কোনও প্রাচীন রসিক একটি সুবর্ণ উপবীত যোগ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল নানা ফুলজল চন্দনের অত্যাচারে উপবীত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তবে

উহা সুবর্ণই বটে।

মনীশের চোখ চকচক করে উঠল।

।। চার ।।

কোথাও কোনও ভুল হল কী? প্রত্যেকটা পদক্ষেপ খুব ভাল করে ভেবে দেখল যদু। বারবার ভাবল। কয়েকদিন ধরে। পল্টু টাকাটা হাতে পেয়ে ভারী অবাক গলায় বলে উঠেছিল, এত টাকা!

এত টাকা। কথাটা সেই থেকে বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘা মারছে। পল্টুর দিকে এমন একখানা রক্ত-জল করা চাউনি হেনেছিল যে ছেলেটা আর মুখ খোলেনি। টাকাটা একটা লম্বা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পল্টু কোমরে বেঁধে নিয়েছিল। ওপরে ঝুলিয়ে দিয়েছিল জামা।

এই একটা ভুল। পল্টুর হাত দিয়ে টাকাটা পাঠানো ঠিক হয়নি। ছেলেমানুষ যদি টাকার আনন্দে লোককে বলে বেড়ায়?

কর্ত্রী কবে মারা যাবেন তা বুঝতে পারছে না যদু। তবে বাড়াবাড়িই যাচ্ছে। খুব বাড়াবাড়ি। তিনদিন ধরে জ্ঞান নেই। জ্ঞান আর ফিরবেও না। বেঁচে আছে শুধু নানা ওষুধপত্র, অকসিজেন, যন্ত্রপাতির জোরে। টাকার শ্রাদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মিনিটের আয়ু কিনতে বেরিয়ে যাচ্ছে শয়ে শয়ে টাকা। এ রোগে বাঁচে না সবাই জানে। আর এ ভাবে বেঁচে থাকাকে বাঁচা বলাও যায় না। তবু বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে।

ইদানীং বাড়িটা দুপুরবেলা ফাঁকা থাকছে। মৃগাঙ্কবাবু মৃগাঙ্কবাবুর অফিসে, সুমিত সুমিতের অফিসে, যদু যদুর অফিসে। তাই কদিন হল পাড়ার একটা ছেলেকে দারোয়ান রাখা হয়েছে। পানের দোকানী মহেন্দ্রর ছেলে বিশু। ভাল ছেলে।

দুপুরবেলাটা অফিসে ভারী উদ্বেগে কাটে যদুর। অতগুলো টাকা রান্নাঘরের কাবার্ডে পড়ে আছে। কে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই বলে বিশুর কাছেই বাড়ির চাবি থাকছে আজকাল।

যদু একটু আপত্তি তুলেছিল এ ব্যাপারে। রাতে খাওয়ার টেবিলে যখন বাপ-ব্যাটায় খেতে বসেছে তখন মৃগাঙ্কবাবু বললেন, ভালই হল। এবার থেকে চাবি বিশুর কাছেই থাকবে। কার কখন বাড়ি আসবার দরকার হয় তার তো ঠিক নেই। কল্পনার এই অবস্থা।

যদু বলল, বিশু বাইরের লোক। তার কাছে চাবি দেওয়াটা কি ঠিক হবে? আমি তো সাড়ে পাঁচটাতেই চলে আসি।

সুমিত বাগড়া দিল, সাড়ে পাঁচটার আগেই দরকার হতে পারে যদুদা। বাড়িটার একসেট চাবি তোমার কাছে থাক, ডুপলিকেটটা বিশুর কাছে। ওকে আমি ভালই চিনি। চোরটোর নয়।

চাবি সুতরাং দিতে হল। যদুর দুশ্চিন্তা বাড়ল। কিন্তু সে রান্নাঘরে ঢুকে কাবার্ড খুলবে না একথা যদু জানে। খুলবার কারণও নেই। কথাটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে যদু, কিন্তু মনকে বোঝাতে পারে না। যদি কৌতূহলবশে বাড়িটায় ঢুকে ঘুরেটুরে দেখে বিশু? যদি "কী আছে দেখি?" বলে খুলে ফেলে কাবার্ড? কাবার্ডের চাবি যদিও যদুর হেফাজতে, কিন্তু কাবার্ডের পাল্লা তো আর মজবুত নয়!

মরার আগে আর কর্ত্রীর যে জ্ঞান ফিরবে না এ কথাটাও যদু বুদ্ধি দিয়ে বোঝে। কিন্তু তার মন কেবলই কু গায়, কে জানে বাবা, আজকালকার তেজী ওষুধবিষুদ যদি কর্ত্রীর হুঁশ ফিরিয়ে দেয়? যদি কর্ত্রী চোখ মেলেই বলে, আমার টাকা!

এইসব ভাবতে ভাবতে যদু ভারী আনমনা হয়ে গেল। তারপর মনের অশান্তি সহ্য করতে না পেরে সে কার্বাড থেকে টাকাটা সরিয়ে আনল এক রাতে। নিজের বালিশের সেলাই খুলে খানিক তুলো বের করে টাকাটা ঢুকিয়ে সেলাই করে দিল। আর নিজের ঘরের দরজায় লাগাল একটা নতুন-কেনা ঝকঝকে দামী তালা।

ভুলটা বুঝতে বেশ দেরী হয়ে গেল যদুর।

সিঁড়ির মুখেই তার একতলার ঘর। দরজায় ওরকম ঝকঝকে তালা দেখে মৃগাঙ্কবাবু প্রথম দিনই থমকে গেলেন। তারপর যদুর দিকে ফিরে বললেন, তোর ঘরে আবার ওরকম দামী তালা কেন রে?

যদু এত চমকে গেল যে, কথা বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে। কিন্তু কিছু তো বলতে হবে। তাই

বলল, তালাটা পড়ে ছিল ঘরে। এমনি লাগিয়েছি।

মৃগাঙ্কবাবু জবাবটায় খুশি হলেন না। বললেন, তালার কী দরকার! বাইরের দরজা বন্ধ থাকে, দারোয়ান থাকে—

কথাটা শেষ করলেন না মৃগাঙ্কবাবু। ওপরে উঠে গেলেন, যদু সিঁড়ির নিচে কাঁপা বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, ভুল হল! ভুল হল!

রাত্রে চল্লিশ হাজার টাকার বালিশে মাথা রেখে শুল যদু। কিন্তু ঘুম এল না। অতগুলো টাকা ভরেছে বলে বালিশটা উঁচু, শক্ত, ভিতরে খচমচ শব্দ। আর মাথায় দুশ্চিন্তা, ইস! ভুল হল! ভুল হল!

পরদিন সকালে ফের নতুন দুশ্চিন্তায় পড়তে হল যদুকে। অফিসে বেরোনোর সময় বিশু তাকে বলল, তোমাদের বাড়িতে বালিশ তোশক কিছু ফেটেছে নাকি? চারদিকে এত তুলো উড়ছে কেন বলো তো!

তুলো! বলে স্তব্ধ হয়ে থাকে যদু। তার বালিশের বের করা তুলো বোকার মতো জমাদারের ময়লা ফেলার বালতিতে রেখেছিল। নিমকহারাম তুলো বাতাসে ভর করে ছয়ছত্রখান হয়েছে চারদিকে। সে ভালমানুষের মতো মুখ করবার চেষ্টা করে বলল, এ বাড়ির নয়।

বিশু বলল, এ বাড়িরই। জমাদার বলছিল—

কথাটা শেষ করতে দিল না যদু। তাড়াতাড়ি বলল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা বালিশ ফেটেছিল বটে।

সারাদিন তালা আর তুলোর ব্যাপারটা তার মাথাকে ঘুলিয়ে দিচ্ছিল। বেফাঁস সব কাণ্ড করে ফেলছে যে সে! সাঙ্ঘাতিক সব ভুল করছে। প্রত্যেকটা কাজ এখন তার হিসেব করে করা উচিত।

এইসব দুশ্চিন্তায় পরের রাতটাও ঘুম হল না যদুর। সকালে পেটটা নরম হল, ভাল করে খেতে পারল না।

তার পরের রাতে কর্ত্রীকে নিয়ে একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখল যদু। কর্ত্রী যেন শিয়রের কাছে কাঁচি নিয়ে দাঁড়িয়ে। কচকচ করে বালিশের কানা কেটে ফেলছেন। যদু আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে ঘুম ভেঙে উঠে বসল। জেগে উঠে আতঙ্ক বাড়ল বৈ কমল না। তার মনে হল, কর্ত্রী বোধহয় নার্সিং হোম-এ মারা গেছেন। কর্ত্রীর প্রেতাত্মা এসে যদুকে ভয় দেখিয়ে গেল।

কিন্তু দিনের বেলা ভয়টা আর রইল না। সকালেই নার্সিং হোমে রোজকার মতো ফোন করে সুমিত জেনে নিল, কর্ত্রী বেঁচে আছেন। যদিও খুবই খারাপ অবস্থা।

সাবধানের মার নেই। যদু রান্না করতে করতেই এসে ফোনের কথাবার্তা শুনে নিয়েছিল। মুখখানা যতদূর সম্ভব নিরপরাধ রেখে সে সুমিতকে জিজ্ঞেস করল, মায়ের কি জ্ঞান ফিরে আসতে পারে ছোড়দা?

সুমিত ম্লান একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল, ফিরে আসার কোনও চান্সই নেই। ডিপ কোমা।

কথাটা যদুও জানে। তবু কেবলই ভয় হয়, কর্ত্রী যদি হঠাৎ চোখ মেলেন। যদি চোখ মেলেই বলে ওঠেন, আমার টাকা?

ভয় এমনই জিনিস যে, তাকে বাড়তে দিলে বাড়ে। যদুর আরও একদিন ঘুম এল না। মোষের মতো তার ঘুম ছিল। স্বপ্নের বালাই ছিল না। এখন ঘুম হচ্ছে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে চটকার মতো তন্দ্রা। তার খিদে প্রচণ্ড। ভাত সে খায় শহুরে মানুষের তিন গুণ। কদিন হল খিদে বলে বস্তু নেই। মুখে অরুচি। বিশু অবধি একদিন বলল, তোমাকে তো বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।

যদু ম্লান হেসে বলল, মায়ের অবস্থাটা তো জানো, দশ বছর মা বলে ডাকছি, সেই মা চলে যাচ্ছেন।

বিশু মাথা নেড়ে বলল, সে তো বটেই।

বালীগঞ্জের পুবে তাদের বাড়ির সামনেকার রাস্তাটা গিয়ে সোজা যে রাস্তায় মিশেছে তার ডান দিকে মোড় নিয়ে আর একটা গলির মধ্যে এক তান্ত্রিক থাকে। সন্ধেবেলা ভূতগ্রস্তের মতো সেই তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে হাজির হল যদু। আগেও বার কয়েক ভাগ্য-টাগ্য দেখাতে আর বড়

দুই ছেলের মতি ফেরাতে এর কাছে এসেছে যদু। একখানা টালির ঘরে তান্ত্রিকের বাস। পরনে রক্তাম্বর। বুড়ো মানুষ। গরীবেরা আসে। কাজ হয় কি না তা যদু বলতে পারবে না। তার তো হয়নি। তবে লোকে বলে, এ তান্ত্রিক পিশাচ-সিদ্ধ।

আরও দুটো লোক ছিল। তারা চলে গেলে যদু একটু ঘেঁষ হয়ে বসে বলল, একটা ব্যাপার একটু ভাল করে গুণে বলে দিতে হবে বাবা। বড় দুশ্চিন্তায় আছি। একজন মানুষ মরো-মরো হয়েও বেঁচে আছে। সে মরবে কবে!

তান্ত্রিক মিট মিট করে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তার নাম কী?

যদু একটু চমকে উঠল। বলল, নাম বলতে হবে?

অনেক কিছুই বলতে হবে। নাম বয়স ঠিকানা জন্মতারিখ।

অত পারব না।

তবে গুণবো কী দিয়ে? বলে তান্ত্রিক মোটে তিনটে দাঁতে হাসল।

নাম বলবে যদু? খানিকক্ষণ ভাবল সে। বেশী দূরের পাল্লা নয় তো এটা। পাড়ার মধ্যেই বলা যায়। যদু যদি নাম বলে তাহলে পাঁচ কান হবে। ভাল হবে না ব্যাপারটা।

তান্ত্রিক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি কী চাইছো? লোকটা মরুক?

আমতা আমতা করে যদু বলল, একরকম তাই। বড় কষ্ট পাচ্ছেন।

তবে চান্দ্রায়ণ করো গে। কর্মফল কেটে দেহ ছেড়ে আত্মা ফুস করে বেরিয়ে যাবে।

তার যে অনেক ঝামেলা। আর কোনও উপায় নেই?

থাকবে না কেন? মারণ-যজ্ঞ আছে। বান আছে। তবে নিজের লোকের জন্য মানুষ ওসব করে না। ওসব শত্রুনাশের জন্য করতে হয়।

মরিয়া যদু বলে ফেলল, ধরুন এও আমার শত্রু।

তাহলে নাম বলো, বান মেরে দিই।

হবে?

না হবে কেন? লোকে তো পয়সা দিয়েই করাচ্ছে।

যদু অনেক দ্বিধা সংকোচ করল। বান মারবে? সেটা কি উচিত হচ্ছে? তবু শেষ অবধি সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সে বলল, ঠিক আছে। নাম বলছি, কিন্তু দেখবেন যেন আর কারও কানে কথাটা না যায়।

তান্ত্রিক মাথা নেড়ে বলল, যাবে না। কুড়িটা টাকা রেখে যাও।

আজ দশ দিয়ে যাচ্ছি। কাজ হলে আরও দশ।

কাজ হলে কেউ কি আর বাকি শোধ করতে আসে?

যদু হাসল, চল্লিশ হাজার টাকা আছে তার। এ লোকটা তাকে মনে করে কী? সে কুড়ি টাকাই বের করে দিল, তারপর কর্ত্রীর নাম একটা কাগজে লিখে তান্ত্রিকের হাতে দিয়ে বলল, কাজ হলে আরও দশ টাকা দিয়ে যাবো। কিন্তু কবে হবে?

দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই।

ও বাবা! অত দিন লাগবে?

তোমার কবে চাই?

আজ। এক্ষুনি।

তান্ত্রিক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, এসব মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপার। আচ্ছা দেখছি। তোমার নাম কী?

আমার নাম! আমার নাম দিয়ে কী হবে?

বলতে চাও না? ঠিক আছে। বলে তান্ত্রিক কেমন একধরনের চোখে তাকাল। যদু চোখ ফিরিয়ে নিল।

বাড়ি ফিরে এসে তার আবার মনে হতে লাগল, কাজটা কি ঠিক হল? মনের কথা প্রকাশ হয়ে গেল একজনের কাছে। একটা লোক তো জেনে গেল যে, সে কর্ত্রীর মৃত্যু চায়!

আবার ভুলভাল করছে যদু। এ কাজটা ঠিক হয়নি। এভাবেই সে ধরা পড়ার রাস্তা খুলে দিচ্ছে।

অবশ্য ধরা পড়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই। কর্ত্রী আর সে ছাড়া টাকার কথা কেউ জানত না।

যদি সে টাকাটা সময়মতো পাচার করতে পারে তাহলে কোনও ভয় নেই। যতক্ষণ টাকাটা তার নিজের কাছে থাকবে ততদিনই এই দুশ্চিন্তা।

সেদিন রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বাপ-ব্যাটার কথা হচ্ছিল। প্রসঙ্গটা ভীষণ বিপজ্জনক।

সুমিত হঠাৎ মাংসের হাড় চুষতে চুষতে বলল, বাবা, মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কী হবে? আর লকারের অত গয়না?

মৃগাঙ্ক দুধের বাটিতে রুটির টুকরো ছেড়ে বললেন, আপাতত কিছু করার নেই।

জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখলে ভাল করতে।

মৃগাঙ্কবাবু মৃদু একটু হেসে বললেন, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট একটা কেন, কয়েকটাই আছে। সেগুলো ছাড়াও তোমার মা আলাদা করে টাকা জমাতেন। সেসব অ্যাকাউন্টের টাকা ফ্রিজ হয়ে থাকবে।

সে কি অনেক টাকা?

মন্দ হবে না। আমার ভাল আন্দাজ নেই। তবে কম নয়। ব্যাংক ছাড়া বাড়িতেও বোধহয় জমাতেন। দেখতে হবে।

শুনতে শুনতে বুক দুরদুর করছিল যদুর। গিন্নীমার টাকা-পয়সার হদিশ নিতে নিতে আবার সেই বিয়াল্লিশ হাজারের কথাও কি বেরিয়ে পড়তে পারে? বুকের মধ্যে ভয়ের আর একটা থাবা নাড়া দিয়ে গেল। খিদেটা এত কমে গেছে যে, একখানা মাত্র রুটি খেয়ে আর ইচ্ছেই করল না।

রাত্রিবেলার ঘুমটা কি যদুর চিরতরে চলে গেল? চল্লিশ হাজার টাকার বালিশে গরম মাথাখানা রেখে যদু কেবল এপাশ ওপাশ করে। মাঝে মাঝে কান খাড়া করে শোনে, ওপরতলায় ফোন বাজছে কি না, যদি বাজে তবে সেটা নার্সিং হোমের না হয়ে প্রমিতেরও হতে পারে। বেশী রাতে মাঝে মাঝে প্রমিতবাবুর ফোনও আসে আমেরিকা থেকে। তান্ত্রিকের বানে কাজ হল না বোধহয়। ব্যাটার ক্ষমতা নেই, কেবল টাকার ধান্দা।

যদু বুঝতে পারছে এতগুলো টাকা এভাবে আগলে থাকা তার ঠিক হচ্ছে না। লগ্নী করা দরকার, খাটানো দরকার। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। দেশে গিয়ে সে যদি এখন বোকার মতো জমিজমা কেনা শুরু করে তাহলে পাঁচটা কথা উঠবে।

গিন্নীমা মরতে এত দেরী করবে জানলে যদু টাকাটা এখনই সরাত না। একটু সময় নিত। টাকাটা আবার জায়গামতো রেখে কয়েকদিন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নেবে কি? বুদ্ধিটা মন্দ নয়। কিন্তু যদু তা প্রাণে ধরে পারবে না। টাকাটা যে তার একেবারে গায়ে লেপটে থাকে এটারও একটা মৌতাত আছে। তাছাড়া ভয় হল, টাকাটা জায়গামতো না হয় রাখল, কিন্তু কর্তা যদি কখনো দুম করে আলমারির চাবিটা সরিয়ে ফেলেন? অসম্ভব নয়, কারণ গিন্নীমার কোথায় কী আছে তার খোঁজ হওয়ার সময় তো হয়েছে।

পরদিন যদু সকালে উঠল বিস্বাদ মুখ আর দুর্বল শরীর নিয়ে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সুমিত সকালে জগিং করতে যাওয়ার সময় দরজাটা খোলা রেখে যায়। যদু গিয়ে চা করে মৃগাঙ্কবাবুর বিছানায় পৌঁছে দেয়। নিত্যকর্ম। নিজের চায়ের সঙ্গে কয়েক চামচ ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খেল যদু। পেটটা একটু চিনচিন করল। শরীরটা চাঙ্গা হল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। তবে যদু একটা খালি শিশিতে খানিকটা ঢেলে নিয়ে নিজের ঘরে সরিয়ে ফেলল। রাত্রিবেলা ঘুম না এলে খেয়ে দেখবে।

আজ সকালেও জানা গেল, গিন্নী মা দিব্যি বেঁচে আছেন। দিব্যি অবশ্য নয়। এ অবস্থায় দিব্যি তো থাকা যায় না। তবে আছেন। জ্ঞান নেই। জ্ঞান আর ফিরবেও না। মৃগাঙ্কবাবু নিজেই গাড়ি চালিয়ে নার্সিং হোম গিয়ে ফিরে এসে সুমিতকে বললেন, শী ইজ হ্যাংগিং। স্টিল হ্যাংগিং। কোয়াইট এ ফাইটার।

হ্যাংগিং কথাটার মানে যদু জানে। গিন্নীমা এখন সূতোয় ঝুলছেন। সরু সূতোয়। ছিঁড়বে বটে, তবে সেটা কবে, কখন?

সকালে এরা তেমন কিছু খায় না। রুটি ডিম ফলের রস খেয়ে অফিসে চলে যায় বাপে ব্যাটায়। লান্‌চ করে বাইরে। তাই যদুর সকালের দিকটায় তেমন খাটনী নেই। তবু আজ সামান্য কাজ করতেই তার হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। খুব জ্বর হলে যেমন চারদিকটা নিঃঝুম আর

ঘোর-লাগা মনে হয়, ঠিক তেমনই লাগছিল যদুর।

ঝি শ্যামার মা পুরোনো লোক। কথায় রাখঢাক নেই। যদু যখন ডিম ফেটাচ্ছে তখন সামনে বসে চা খাচ্ছিল। আচমকা বলল, কী গিলেছো বলো তো! গন্ধ আসছে।

যদু একটু চমকে উঠে বলল, কিসের গন্ধ?

ও গন্ধ যে চিনি। শ্যামার বাপ কি কম জ্বালায়? কিন্তু তোমার তো এ দোষ আছে বলে জানতুম না, তাও আবার সকালে!

ওষুধ খেয়েছি। ও সব নয়।

তোমার ওষুধের দরকার হল কেন?

শরীরটা ভাল নেই।

শ্যামার মা একটু অদ্ভুত গলায় বলল, কর্ত্রী নেই, এখন তো রাজ্যপাট তোমার হাতে।

যদু দশ বছরের পুরোনো চাকর। এ বাড়িতে তার অধিকার ঠিকে ঝিয়ের চেয়ে বেশী। তাই সে একটু কঠিন চোখ করে শ্যামার মায়ের দিকে তাকাল।

শ্যামার মা গ্রাহ্য করল না। বলল, তান্ত্রিকের কাছেই বা হঠাৎ যাতায়াত কেন?

তান্ত্রিক! যদু হাঁ করে রইল।

ওর পাশেই তো দিশি মদের দোকান। শ্যামার বাপ তোমাকে দেখেছে।

কঠিন চোখ ভাসা ভাসা হয়ে গেল যদুর। ভুল হচ্ছে। বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে সব। গণ্ডগোল করে ফেলছে। যতদূর সম্ভব নির্বিকার গলায় বলল, গেলে দোষ আছে নাকি! কত লোকই তো যায়।

শ্যামার বাপ বলে, ও লোকটা চারশ বিশ।

তা হবে।

শ্যামার মা এঁটো কাপ ধুতে ধুতে বলল, দুটো ডিম দেবে? আজ বাজার হয়নি।

অন্য সময় হলে যদু দিত না। শ্যামার মায়ের একটু হাতটান আছে। এটা ওটা সরায়। মাগুনেও খুব। চাইতে মুখে আটকায় না, গিন্নীমা ইদানীং ওর মাগুনে স্বভাবের জন্য তিতিবিরক্ত হচ্ছিলেন। তিনি তবু দিতেন। যদু দেয় না।

শ্যামার মা জায়গামতো কাপটাপ রাখতে রাখতে বলল, তোমার হাত দিয়ে তো জল গলে না। যা কিপটে।

যদু ধমক দিয়ে বলল, বেশী কথা বোলো না তো। আমার মেজাজ ভাল নেই।

এই বলে ফ্রিজ থেকে দুটো ডিম এনে দিল।

একটা পেঁয়াজও দাও।

আর কি কি চাই ফর্দ করে এনেছো নাকি?

এ বাড়ির কম পড়বে না, তোমার চিন্তা নেই। ডিমে পেঁয়াজ না হলে চলে? বললুম না বাজার হয়নি। তোমার হাতেই তো এখন রাজ্যপাট বাপু।

অফিস যাওয়ার সময় বাসে উঠে যদু ভাবতে লাগল, রহিম শেখের শ্মশানধারের জমিটা ভাল। বেচবে বেচবে করছে। সেটার দাম এমন কিছু বেশী পড়বে না। বিঘে দেড়েক হবে। এইবেলা কিছু কিছু লগ্নী না করলেই নয়। বালিশের মধ্যে থেকে টাকাটা বড় জ্বালাচ্ছে। এ যেন বোমা মাথায় দিয়ে শোওয়া।

বাসের ঝাঁকুনিতে যদুর ঘুম এল। রড ধরে দাঁড়িয়ে সে একটু ঘুমিয়ে নিল। বাসে ঘুমোতে ঘুমোতেও সে স্বপ্ন দেখল, তার পাশে দাঁড়িয়ে তান্ত্রিকটা খুব চোখা চোখে তাকে দেখছে।

হঠাৎ বলল, তুমিই সেই লোক না? সেই খুনে?

আমি! না না! বলে যদু চমকে জেগে ওঠে।

অফিসের দারোয়ান রাম ভরোসা সুদে টাকা খাটায়। দিন দিন হিসেবে তার সুদ বড় কম নয়। টাকায় আট পয়সা। একশ টাকা নিলে এক মাসে সুদ দাঁড়ায় পনেরো টাকা। গত মাসে তার কাছ থেকে সত্তর টাকা ধার করেছিল যদু। এ মাসে আর শোধ দিতে পারেনি। কিন্তু বিয়াল্লিশ হাজার টাকার সুবাদে মাইনের টাকাটা তার বেঁচেই গেছে। রাম ভরোসার সুদ টানার কোনও মানেই আর হয় না। তাই সে আজ টাকাটা সুদ সমেত ফেরত দিয়ে দিল।

রাম ভরোসা একটু অবাক হয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, হঠাৎ কি লটারি-টটারি পেলে নাকি? টাকা এল কোত্থেকে?

যদু একটু তটস্থ হল। ফের কোনও ভুল করল নাকি? আমতা আমতা করে বলল, এবার বাড়িতে কিছু কম পাঠালাম।

তোমার বউয়ের তো শুনি ভারী অসুখ। মেলা টাকা লাগবে বলছিলে।

যদু কোনও সদুত্তর খুঁজে পেল না। মাসের বারো চৌদ্দ তারিখে ফট করে সত্তর টাকা এবং তার সুদ ফেরত দেওয়া যে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার তার মতো লোকের পক্ষে, এটা সে যেন হঠাৎ বুঝতে পারল। না, সে টাকাটা চেপে রাখতে পারছে না। তার টাকা জানান দিচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সে একেবারে ল্যাজে গোবরে হবে একদিন।

বিকেলে মৃগাঙ্কবাবু নার্সিং হোম-এ যান না। যায় সুমিত। মৃগাঙ্কবাবু আজ একটু ভাল পোশাক পরে বেরোলেন। লক্ষণ যদু আজকাল চেনে। আজ বাবু লেক-এ যাবেন না, যাবেন দীনেশবাবুর বাড়ি। মনের ওপর বড্ড চাপ যাচ্ছে তো! তাই বোধহয় আজ একটু ফূর্তি হবে।

ফাঁকা বাড়িতে যদুরও আজ একটু ফূর্তি করতে ইচ্ছে হল। ক্যাবিনেট থেকে ব্র্যান্ডির বোতল বের করে সে জল মিশিয়ে খেতে লাগল। মনটাকে আর শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করার দরকার।

ফোন এল রাত আটটা নাগাদ।

সুমিত বলল, যদুদা, বাবা কোথায়?

কেন, মায়ের অবস্থা কী?

বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বলছে ভেরি ক্রিটিক্যাল। রাতটা নাও কাটতে পারে।

যদুর বুকটা আনন্দে দুলে উঠল, আবার মুহূর্তের মধ্যে হতাশায় ডুবে গেল। সে বলল, এরকম তো কয়েকবার হল।

সুমিত বিরক্ত হয়ে বলে, তাই তো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো তৈরি থাকতে হবে।

বাবা বোধহয় দীনেশবাবুর বাড়িতে আছেন।

আমি দীনেশকাকুর বাড়িতে ফোন করছি। কিন্তু লাইন পাওয়া যাবে কি না জানি না। তুমি বরং ওখানে চলে যাও। বাবাকে ড্রাইভ করতে দিও না। বয়স হয়েছে, তার ওপর হয়তো নার্ভাস হয়ে র‍্যাশ ড্রাইভ করবেন।

আচ্ছা, যাচ্ছি।

ক্রিটিক্যাল কথাটার অর্থও যদু জানে। কিন্তু কথা কথাই। ডাক্তাররা কবে থেকে বলছে, এই মরে কি সেই মরে। গিন্নীমা সুতোয় ঝুলছেন। কিন্তু সেই সুতো মাকড়সার সুতোর মতো। ঝুলে থাকে তো ঝুলেই থাকে, ওঠে নামে জাল বোনে। সুতো ছেঁড়ে না। কখনোই ছেঁড়ে না।

যদু হুটপাট করে বেরিয়ে পড়ল।

দীনেশবাবুর বাড়ি বেশি দূরেও নয়, আর যদু রাস্তাটা এসেছে বাসে। তবু দোতলায় উঠতে কেমন হাঁফ ধরে গেল যদুর। শরীরটা কাহিল লাগল। শীতেও ঘাম হতে লাগল।

দোতলাটা আজ বড্ড ফাঁকা ফাঁকা। বাইরের ঘরে কেউ নেই। দীনেশবাবুর ঘরদোর এরকমই হাট করে খোলা থাকে। লোকটা মোটেই গেরস্ত নয়। যদু কয়েকবার গলা খাঁকারি দিল বারান্দা থেকে। কেউ এল না। দারোয়ান অবশ্য বলেছে, মৃগাঙ্কবাবু ভিতরেই আছেন।

তবে যদুর চেনা বাড়ি। বহুবার এসেছে আগে। ইদানীং আসছে না, গিন্নীমা দীনেশবাবুর ওপর চটে যাওয়ার পর থেকে।

যদু বাইরের ঘর পার হয়ে ভিতরের প্যাসেজে পা দিল। দু ধারে দু সারি ঘর। সবই বন্ধ। একটা ঘরের ভিতরে আলোর একটু আভাস আছে, দরজার তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

গলা খাঁকারি দিল যদু। কাজ হল না। তারপর দরজায় টোকা দেওয়ার জন্য হাত তুলল।

ঠিক এই সময়ে প্যাসেজের বিপরীত দিকে দেখা দিল একটা লোক।

লোকটা কালোমতো। পরনে ধুতি, গায়ে আলোয়ান। ভারী নিরীহ চেহারা। কাকে খুঁজছেন? মাখনের মতো নরম বিনয়ী গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা।

যদু এগিয়ে গিয়ে একটা প্রণাম করে বলল, আমি মৃগাঙ্কবাবুকে খুঁজছি। বড্ড দরকার।

মৃগাঙ্কবাবু? বলে লোকটা যেন ভারী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তারপর বলল, আসুন, এদিকে

আসুন।

যদু প্রথম নজরেই কালোবাবাকে চিনে গেছে। যে-ঘরটায় যদুকে এনে ঢোকাল সেটাও যদুর বেজায় চেনা। যত সাধু-সন্ন্যাসীকে এ ঘরেই এনে তোলেন দীনেশবাবু।

কালোবাবা তার চৌকিতে বসে ভারী কুণ্ঠিত গলায় বলেন, একটু যে বসতে হবে বাবা আপনাকে, উনি বড্ড ব্যস্ত রয়েছেন।

যদু মাথা নেড়ে বলে, বসার উপায় নেই। তাঁর স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ।

ও, তা-বলে ভারী যেন লজ্জায় পড়ে যান কালোবাবা। তারপর বলেন, মৃগাঙ্কবাবুকে এখন ডাকাটা বোধহয় ঠিক হবে না।

যদু মোটামুটি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে। এ বাড়িতে অনেক রকম হয়, সবই যদু জানে। তবু একটু গাড়ল সেজে বলল, ডাকতে নেই কেন কালোবাবা? ও ঘরে কী হচ্ছে?

কালোবাবা যেন লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশে গেলেন। তারপর সরলভাবেই বলেন, সেই যে ক্রৌঞ্চ মিথুনকে বাধা দিয়েছিল শবর, জানেন তো? তারপর সেই পাপে শবর আর থিতু হতে পারল না। আপনি বসুন একটু।

যদু বলল, ওঁর ছেলে নার্সিং হোম থেকে ফোন করেছে একটু আগে, অবস্থা খুব খারাপ, ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।

কালোবাবা ভারী অসহায় চোখে যদুর দিকে চেয়ে থাকেন, তারপর বলেন, আপনি ওঁর কে হন?

ও বাড়িতে কাজ করি।

কালোবাবা মাথাটা নীচু করে বলেন, এখান থেকে আমাকেও কত কী দেখতে হচ্ছে বাবা, বড় কষ্ট।

কিসের কষ্ট?

দীনেশবাবু যে বড্ড পাগল লোক। পাপ-পুণ্যি সব কিছু একসঙ্গে চটকে ফলার মাখতে চান। একই ছাদের নীচে মদ মেয়েমানুষ সাধু দরবেশ, তাও কি হয়? ওর মনটা কিন্তু গঙ্গাজল। কিন্তু বাঁধ নেই যে।

যদু একটু মিচকের মতো বলল, এখানে খুব ফূর্তি হয় বুঝি?

সে তো হয়। তাতে দোষই বা কী? কিন্তু আমাকেও টেনে তাতে নামায় যে?

যদু চোখ দুটো বড় বড় করে তাকায়, আপনাকেও?

দীনেশবাবা যে বড্ড পাগল। আমি তুকতাক জানি না, যোগবিভূতি নেই, ম্যাজিক করতে পারি না। তবু চাপাচাপি করে বড্ড। শেষে রেগেমেগে বলে, তাহলে মদ খাও, মেয়েমানুষ নিয়ে শোও, তিনপাত্তি খেল।

দীনেশবাবু কেমন লোক তো যদু ভালই জানে। কালোবাবার পরিণতি কী হবে তাও সে আন্দাজ করতে পারে। তবে এই সরল সোজা লোকটাকে তার খারাপ লাগে না। একটু কষ্টও হয় তার। জিব দিয়ে সে চুকচুক করে একটা আপসোসের শব্দ করে। মৃদুস্বরে বলে, ছিঃ ছিঃ!

কালোবাবা এই সমবেদনায় একটু উথলে ওঠেন। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। বলেন, বড় কষ্ট দিচ্ছে। ওই যে বন্ধ দরজাটা দেখছো ওটা ওই ঘরে যাওয়ার। এখন বন্ধই থাকে। ওই ঘরে মেয়েরা আসেন-টাসেন। দীনেশবাবা কী করেছেন জানো? ওই দরজায় একটা ছিদ্র রেখেছে। আমাকে বলে, তোমার তো কাম নেই, তা ওই ফুটোয় চোখ রেখে মাঝে মাঝে দেখো, শরীর তপ্ত হবে।

যদু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকে।

কালোবাবা তার দিকে চেয়ে বলেন, যাও না নিজের চোখে দেখে এসো। দেখে বোঝো দীনেশবাবা আমাকে কেমন কষ্ট দিচ্ছে।

যদু সভয়ে বলল, দেখা যায়?

কালোবাবা মাথা নেড়ে বলে, আমি কখনও চেষ্টা করিনি। তবে দীনেশবাবা যখন ব্যবস্থা করেছে তখন দেখা যায় বৈকি, যাও না, গিয়ে দেখ।

যদু ওঠে।

ফুটোর মধ্যে একটা ম্যাজিক আই পরানো। তাতে চোখ রেখে যদু প্রথমটায় তেমন কিছু দেখতে পেল না। ঘরের আলোটা বড্ড কম। ক্রমে বিছানা এবং বিছানার ওপর দুটো বে-আব্রু শরীরের জড়াজড়ি তার নজরে পড়ল। যদু সরে এল।

কালোবাবা তার দিকে চেয়ে বললেন, মেয়েটার স্বামী আছে, তার বড্ড অসুখ। আমার কাছে এসে মাঝে মাঝে কাঁদে। আবার দিব্যি সেজেগুজে—

কালোবাবা কথাটা শেষ করলেন না। মানুষের বিস্ময়কর বৈপরীত্যে অবাক মেনেই যেন দুঃখিতভাবে মূক হয়ে গেলেন।

তারপর অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা রইল না। একটা নিঃস্তব্ধতার বলয় ঘিরে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে একটা দরজা খোলার শব্দ হল।

কালোবাবা যদুর দিকে চেয়ে বললেন, ওই বোধহয় বেরোলেন, যাও, গিয়ে খবরটা দাও।

বাইরের ঘরে মৃগাঙ্কবাবুর মুখোমুখি বসে মেয়েটা সোফায় বসে চুল ঠিক করছে। মুখে হাসি-হাসি ভাব। দরজার আড়াল থেকে দেখল যদু। তার বুকের মধ্যে এলোপাথাড়ি হাতুড়ির ঘা পড়ছে দমাদম। এই কি ঝড়ুয়া মিস্তিরের সেই ন্যাকা সতীসাধ্বী বউ? অনেক পাল্টে গেছে, তবু কি চিনতে ভুল হয় যদুর? এখন অলকার মারকাটারি চেহারা। পরনে দাঙ্গা বাধানোর মতো পোশাক। ঝলমলে চুড়িদার। তার ওপর জরি বসানো জ্যাকেট। পায়ে সরু কাজ-করা নাগরা। গায়ের রংটা অনেক খুলেছে এখন। চোখমুখ সবই যেন বিজলী হানছে চারদিকে।

মাথাটা সামান্য পাক খাচ্ছিল যদুর। চৌকাঠ ধরে সে একটু দাঁড়াল। বাবুর হাতে একটা গ্লাস তাতে হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি কিছু হবে। পরিশ্রম গেছে। বুড়ো বয়সে মেয়েমানুষের ধকল। এখন একটু চাঙ্গা হচ্ছিল।

যদুর হঠাৎ মনে পড়ল, বেরোবার আগে সেও নিশ্চিন্তে বসে ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছিল। সর্বনাশ। তাড়াহুড়োয় গ্লাসটা ডাইনিং টেবিলের ওপরেই রেখে চলে এসেছে। আজকাল বড্ড ভুল হচ্ছে তার। বড্ড ভুল হচ্ছে।

বাবা?

মৃগাঙ্কবাবু চমকালেন না, অপ্রস্তুতও হলেন না। মুখ ফিরিয়ে যদুকে দেখে সামান্য উদ্বেগের গলায় বললেন, কী রে? তুই হঠাৎ যে!

যদুর চোখ অলকার দিকে। আর একটা গ্লাস তুলে অলকাও মদ খাচ্ছে। খুব ছোটো ছোটো চুমুকে। তার দিকেও তাকাল, ঠিক যেমন চাকর-বাকরের দিকে বাবুবিবিরা তাকায়।

যদু অলকার দিকে চোখ রেখেই বলল, একবার নার্সিং হোম-এ যেতে হবে।

মৃগাঙ্কবাবু গ্লাসটা টেবিলে রেখে বললেন, হয়ে গেছে নাকি?

অবস্থা বড্ড খারাপ।

মৃগাঙ্ক গ্লাসটা প্রায় এক চুমুকে শেষ করলেন। তারপর উঠলেন, চল্।

অলকা চুকচুক করে মদ খাচ্ছে। কোনো ভাবান্তর নেই।

কিন্তু যদুর আছে। যদুর বুকের ভিতরটায় হঠাৎ পেট্রোলে আগুন লাগার মতো একটা শিখা লাফিয়ে উঠছে। যদু জ্বলছে। দাঁতে দাঁত পিষছে। মৃগাঙ্কবাবুর গাড়িটা যে বিভীষণ বেগে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পথঘাট যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকটা ধোঁয়াকার। সে দাঁতে দাঁত পিষছে। দু'হাতে এত জোরে স্টিয়ারিং চেপে ধরেছে যে কবজি ব্যথা করছে।

মৃগাঙ্কবাবু স্নেহসিক্ত গলায় বললেন, আস্তে চালা। অত উতলা হচ্ছিস কেন? এরকমই তো হওয়ার কথা ছিল। তোর মায়ের যা অসুখ তাতে যত তাড়াতাড়ি যায় ততই ভাল।

যদু একটা গভীর শ্বাস ফেলল, এই চল্লিশ হাজার টাকা যদি সেদিন তার হাতে থাকত তবে এতদিনে ওই মারকাটারি চেহারার মেয়েমানুষটার সঙ্গে তার ঘর করার কথা।

।। পাঁচ ।।

জীবনের একটা চ্যাপ্টার শেষ হতে চলেছে। মৃগাঙ্ক এরপর একক জীবন কাটাবেন। এই একক জীবনের জন্য কেমন প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তা তার জানা নেই। তবে বাড়িটা বিক্রি করবেন এটা একরকম স্থির। ছেলেদের মত আছে। একটা মোটামুটি মাঝারি ফ্ল্যাট হলেই

তাদের চলে যাবে। কল্পনার সেন্টিমেন্ট ছিল বাড়ি নিয়ে। মৃগাঙ্কর নেই। এত বড় বাড়ি মেনটেন করার অনেক ঝামেলা। ট্যাক্স ভীষণ রকমের বেশী। অনেকগুলো ঘর ব্যবহার করাই হয় না। তার চেয়েও বড় কথা, সুমিত আমেরিকা চলে যাবে। মৃগাঙ্ককেও ডাকাডাকি করছে প্রমিত, তাঁর বড় ছেলে। মৃগাঙ্ক রাজি নন। দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়েছেন। চাকরি জীবনে বহুবার যেতে হয়েছে বিদেশে। আমেরিকায় অবসর জীবন কাটানো এক অভিশাপ। সারাদিন ছেলে, ছেলের বউ চাকরি করবে দাবড়ে। তিনি একা ভূতের মতো ঘরবন্দী থাকবেন। আর যদি কিছু করেনও সেখানে, আমেরিকার দ্রুতগতি জীবনের ধকল এখন সইবে না। সহ্য হবে না শীত। না, তিনি কলকাতায় থাকবেন। একা কিংবা ঠিক একাও নয়। কল্পনা মারা যাওয়ার পর ব্যবস্থা অস্থায়ী হলেও হবে। তাছাড়া এখানে তার নিজস্ব কনসালটেন্সি আছে। সময় চমৎকার ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। বছরে একবার বা দুবার আমেরিকা যাবেন। ছেলেরাও আসবে। এদেশে তাঁর মেয়েটাও আছে। সেও আসবে মাঝে মাঝে। তবু একটু একা লাগতে পারে কখনো-সখনো। কিন্তু সে তো এখনও লাগে।

দীনেশ অবশ্য অন্য কথা বলে, দূর দূর, ফ্ল্যাট কিনতে যাবি কেন? বাড়িটা বেচে দিয়ে আমার কাছে এসে থাক। এত ঘর থাকতে তোর জায়গা হবে না নাকি? আর এখানে দেদার ফূর্তি। অলকাকে তাড়িয়ে অন্য একটাকে আনছি শীগগীরই, দাঁড়া না দেখবি।

মৃগাঙ্কর কানে কথাটা ভাল শোনাল না। অলকাকে তাড়াবি কেন?

ওর অনেক পিছুটান। স্বামী বেঁচে আছে। অসুস্থ। সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান। এসব আমার ভাল লাগে না। ঝাড়া হাত-পা চাই।

মৃগাঙ্ক বন্ধুকে একটু সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখে নিয়ে বলেন, তোর দোষ কী জানিস? তুই সম্পর্ক গড়ে উঠতে দিস না। তার আগেই সম্পর্ক ছিঁড়িস।

সেটাই তো ভাল। রোলিং স্টোন গ্যাদারস্ নো মস। মস গ্যাদার করে লাভ আছে কিছু?

আমি সংসারী মানুষ, তোর মতো বাউণ্ডুলে নই। আমি সম্পর্ক গড়তে ভালবাসি।

দীনেশ একটু খেঁকিয়ে উঠে বলে, তোর দোষ কী জানিস? যেটাকে পাস সেটার সঙ্গেই ডীপ রিলেশন তৈরি করে ফেলিস। অচিরা নামে সেই নাটকের মেয়েটাকে তো ছাড়তেই চাইলি না। তাকে বিয়ে অবধি করতে চেয়েছিলি।

ওরকম হয়। যার হৃদয় আছে তারই হয়।

এসব করতে হলে হৃদয়টা বাড়িতে রেখে বেরোতে হয়, নইলে গোষ্পদে মরণ। এসব মেয়েছেলেকে লাই দিতে নেই। বেশীদিন টিকে গেলেই দাবীদাওয়া তুলে ফেলে। আজকাল তুই বড্ড বেশী অলকা-অলকা করছিস বলেই ওকে তাড়াতে চাইছি।

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, মেয়েটা একটু বেশী কথা বলে ঠিকই, কিন্তু আমার ওকে খারাপ লাগছে না। আর কিছুদিন থাক। নতুন কেউ এলে আমার কেন যেন তার সঙ্গে সেট হতে সময় লাগে।

উদাস চোখে সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে দীনেশ বলে, আমার কিছুই মনে হয় না। মেয়েমানুষ হল স্রোতের জল। আমি বাবা পুকুরে নাইতে পারি না।

তুই হচ্ছিস আমূল চরিত্রহীন।

এইটিই তো আমার চরিত্র। দুর্বলচিত্ত নই বলে আজ অবধি কোনও মেয়ে আমাকে ভোগা দিতে পারেনি। তুই হচ্ছিস রোমান্টিক। আমি হচ্ছি অ্যাডভেনচারাস।

শোন, এখন আমাদের বয়স হয়েছে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন কি নিত্য নতুন ভাল? এখন এমন একজন চাই যে বেশ একটু সিমপ্যাথেটিক, কোঅপারেটিভ, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং।

ওসব তো গেরস্তদের কথা। আমার তো ওসব দরকার হয় না। অলকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এক বছরের ওপর হয়ে গেল। শী ইজ নাউ ওল্ড স্টোরি। একটা বই ক'বার পড়া যায়, এপিক বা ক্ল্যাসিক না হলে? তোর মতলবটা কী বল তো? কল্পনা মরে গেলে অলকাকে বিয়েটিয়ে করে বসবি না তো আবার? রোমান্টিক গেরস্তরা বিয়ের লাইনে ছাড়া ভাবতে পারে না। চিন্তাশক্তির দৈন্য।

মৃগাঙ্ক সামান্য একটু ভেবে বলেন, একটা লোনলিনেস তো আসছে রে। তবে বিয়ের কথা

উঠছে না।

তবে লিভিং টুগেদার পার্মানেন্টলি?

তাও নয়। আমার শরীরের চাহিদা তোর মতো রাক্ষুসে নয়। কয়েক বছরের মধ্যে তাতেও ভাঁটা পড়ে যাবে। এ কয়েকটা বছর অলকাই পার করে দিক না।

ওকে তাড়ালে তোর কষ্ট হবে বলছিস?

একটু মায়া পড়ে গেছে। মাইণ্ড ইউ, প্রেম নয়। মায়া।

তোর মায়ারও বলিহারি যাই। মেয়েটা জলের মতো মিথ্যে কথা বলে। কথায় কথায় চোখের জল ফেলতে বসে। ওইসব দিয়েই তোর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। যাকগে, তোকে বলেছিলাম ওর বরের পেসমেকারের জন্য কিছু টাকা দিতে। দিয়েছিস?

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বলেন, না। খেয়াল ছিল না। কল্পনার জন্য অনেক খরচ হচ্ছে। পার্সোন্যাল অ্যাকাউন্ট-এর বিশেষ নেই। তুলতে হবে কোম্পানি অ্যাকাউন্ট থেকে। কিন্তু খরচটা কোন খাতে দেখাবো বল তো?

কেন, এন্টারটেনমেন্ট? বলে হাঃ হাঃ করে হাসে দীনেশ।

মৃগাঙ্ক একটু ভেবে বলেন, ও হাজার দশেক চাইছে। টাকাটা কম নয়।

দীনেশ গম্ভীর হয়ে বলে, না পারলে কোনও কথা নেই। ইট উইল বি অ্যারেঞ্জড বাই আদার সোর্সেস। তুই ভাবিস না। যখন তোকে টাকার জন্য বলেছিলাম তখন কল্পনার অসুখের কথাটা আমার মাথায় ছিল না। সংসার না করলে এসব বিবেচনা আসেও না। সত্যিই তো, তোর অনেক খরচ এখন।

মৃগাঙ্ক দীনেশের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। তবে একটা কথা মনে পড়েছে। কল্পনার কাছে সবসময়েই কিছু রেডি ক্যাশ থাকত। হাতের কাছে থাকত। অসুখটা হওয়ার পর একবার আমাকে বলছিল, ওর কোথায় কী জমানো আছে। মরার পর যেন সব খোঁজ করি। তখন ওইসব পেটি সেভিংস নিয়ে মাথা ঘামাইনি, তাই মন দিয়ে তখন ওইসব শুনিনি। আবছা মনে পড়ছে, বাড়িতেই কোথাও কোনো আলমারি বা বাক্সে কিছু টাকা আছে। বোধহয় বিশ-ত্রিশ হাজার বা তারও বেশী।

দীনেশ মাথা নেড়ে বলল, কল্পনার টাকা ওকে দিতে যাবি কেন? ডোণ্ড ডু দ্যাট। ওটা ইম্‌মর‍্যাল হবে। আফটার অল ও একটা বেশ্যাই তো।

টাকাটা বেশ্যাবৃত্তির জন্য তো দিচ্ছি না। দিচ্ছি, যদি একটা লোক বাঁচে। টাকাটা কল্পনার হলেও, ওতে এখন আর কল্পনার কী হবে?

দীনেশ মাথা ঘন ঘন নেড়ে বলল, না না, ওটা ঠিক হবে না। পেস মেকারের টাকা আমিই দিয়ে দেবো। কল্পনার টাকাটা তুই অন্য কাজে লাগাস। শী ইজ এ গুড উওম্যান।

মৃগাঙ্ক দীনেশের দিকে চেয়ে আবার একটু হাসলেন। দীনেশকে কল্পনা দু' চোখে দেখতে পারত না।

দীনেশ মৃগাঙ্কর চোখের ভাষা আর হাসির অর্থ বুঝে নিয়ে বলল, কল্পনার একটা দোষ ছিল, তার ধারণা ছিল তোকে আমিই নষ্ট করছি। ও বেচারা তো জানতো না যে, আমরা দুজনেই একসঙ্গে নষ্ট হয়েছি প্রথম যৌবনেই। ওর দোষ কী বল?

তুই তো সেটা কোনদিন কল্পনাকে বুঝিয়ে বললি না। ও তোকে এক তরফা খারাপ ভেবে গেল।

মাথা খারাপ? ওসব বোঝাতে আছে মেয়েদের? আর শালা আমাকে খারাপ ভাবলে কীই বা যায় আসে। আমি তোকে খারাপ করছি, তুই নিজের ইচ্ছেয় হচ্ছিস না, তার মানে তুই বেসিক্যালি ভাল লোক। এ কথা ভেবে যদি কল্পনা একটু সান্ত্বনা পেয়ে থাকে তো ভালই।

মৃগাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই না বললেও আমি বলেছি। কল্পনা বিশ্বাস করেনি যে আমরা দুজনেই একই রকমের লম্পট।

দূর শালা, তখন থেকে কেন মর‍্যালিটি নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছিস। এখন শালা ষাটের ওপর বয়স হয়েছে, এখন ওসব লাম্পট্য-ট্যাম্পট্য শব্দগুলো রিভিউ দরকার। লম্পট আবার কী রে? আমরা তো কাউকে ধর্ষণ বা বলাৎকার করিনি। যার ইচ্ছে বা প্রয়োজন হয়েছে সে-ই এসেছে।

মৃগাঙ্ক এবার সামান্য গম্ভীর হয়ে বললেন, তুই কিন্তু সত্যিই খারাপ, ভীষণ খারাপ। কালোবাবাকে এরকম আটকে রেখে অত্যাচার করছিস কেন? লোকটার বিভূতি বা অলৌকিক ক্ষমতা না থাক, লোকটা বেসিক্যালি ভাল। ছেড়ে দে।

কতটা ভাল?

মেপে দেখব কী দিয়ে? তবে ভাল। শুনলাম, তুই অলকাকে রাতে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলি?

দীনেশ ফিচিক করে একটু হাসে, দিয়েছিলাম, একবার নয়, কয়েকবার। কেঁদেকেটে, পায়ে ধরে মা ডেকে অলকাকে প্রায় পাগল করে দিয়েছে। চেঁচামেচি শুনে গিয়ে অলকাকে আমিই বের করে এনেছি।

এটা করলি কেন?

কতটা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেটা দেখলাম।

আমি গুরুবাদ মানি না। কিন্তু তুই যখন লোকটাকে গুরু বলেই মেনেছিস, তখন এটা করতে গেলি কেন?

কেন, কাজটা কি খারাপ হয়েছে? মেয়েছেলেই তো ঢুকিয়েছি ঘরে। কাঁকড়াবিছে তো নয় রে বাপু। সোমথ মানুষ, সা জোয়ান, অথচ কিছু করতে পারল না। ঢ্যামনা আর কাকে বলে!

দ্যাখ দীনেশ, তোর গুরুর প্রতি অ্যাটিচুড আর মেয়েছেলের প্রতি অ্যাটিচ্যুডে কোনও তফাত নেই। কিছুদিন পর পর তোকে দুই বস্তুই বদলাতে হয়। এটা ভাল নয়।

চুপ শালা ধনপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ বাঁড়েশ্বর। বেশ করব। কালোবাবা ভাল, কালোবাবা ভাল মেলা শুনেছি। কতটা ভাল তার হাতে-কলমে পরীক্ষা হবে না? এই ঘোর কলিতে একটা লোক দিব্যি আমাদের মতো মানুষের মাথার ওপরে বসে ভালোমানুষীর ছড়ি ঘুরিয়ে যাবে, আর আমি তাকে ওমনি ছেড়ে দেবো?

লোকটা যে কষ্ট পাচ্ছে।

কষ্ট কিসের? দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে আছে। নবদ্বীপে পথে পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিল, তুলে এনেছি। ঘি, দুধ, পকেটমানি, তাকিয়া বালিশ কোনও অভাব রাখিনি। কষ্ট কিসের?

এটা কলিযুগ বলেই বলছি। এ যুগে ভাল লোক হয়তো মোটে একটা দুটোই আছে। আর তাদের জন্যই চন্দ্র সূর্য ওঠে, তোর আমার জন্য ওঠে না। যে দু-একটা ভাল লোক এখনও আছে সেগুলোকে যন্ত্রণা দিলে তোর নরকভোগ আছে কপালে।

দীনেশ ফের ফিচিক করে হাসল, ভাল লোকেরা কষ্ট পাবে এটাই কলির নিয়ম যে। দীনেশ ফের গম্ভীর হয়ে বলে, লোকটাকে দেখছি, উল্টে পাল্টে দেখছি। যদি পাশ করে যায় তো বহোত আচ্ছা, যদি পাশ না করে গলাধাক্কা।

আমি বলি কি, তুই ওকে আর পরীক্ষা না করে গলাধাক্কাই দিয়ে দে। লোকটা নিজের মতো করে বাঁচতে চাইছে। কালোবাবা সত্যবাদীও বটে, কিছু লুকোচ্ছে না। নিজের মুখেই বলেছে ওর কোনও ক্ষমতা নেই।

দীনেশ হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ওখানে আমার একটু সন্দেহ আছে।

তার মানে?

দীনেশ একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, কল্পনা যদি আজ মারা যায় তাহলে বলব।

মৃগাঙ্ক এ কথায় একেবারে আপাদমস্তক চমকে উঠলেন, আজ! কেন, কল্পনা আজ মারা যাবে কেন?

দীনেশ মৃদু একটু হাসে। তারপর বলে, অত চমকে উঠলি কেন? ঘটনাটা তো ঘটবেই। আজ হোক বা কাল হোক বা পরশু হোক।

তা তো বটেই। কিন্তু-

কথা শেষ হল না। একটা লোক এসে বলল, মহাশয়, পাইয়াছি। কথা আছে।

দীনেশের সঙ্গে তার বোধহয় গুপ্ত কথা আছে। অনেক লোকের সঙ্গেই দীনেশের গুপ্ত কথা থাকে। দীনেশ উঠে পড়ে বলল, ভিতরের ঘরে যা। অলকা বোধহয় বসে আছে তোর জন্য। আমি একটু বেরোচ্ছি।

অশ্রুমুখী অলকা ভিতরের ঘরে বসে ছিল ঠিকই। মৃগাঙ্ক ঢুকতেই বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিন লক্ষ্মীটি।

দরজা বন্ধ করে মৃগাঙ্ক বললেন, কাঁদছো কেন?

অলকা জবাব দিল না।

অশ্রুমুখী যুবতী দেখলে মৃগাঙ্কর বরাবর কামোত্তেজনা হয়। এখন এই ষাট পেরিয়েও হয়। এর কারণ কি অবলা নারীর প্রতি পুরুষের পৌরুষের স্বাভাবিক জাগরণ? মৃগাঙ্ক একটা তীব্র ভালবাসাও টের পান আজকাল অলকার প্রতি। অথচ মেয়েটিকে বেশ্যা বললেই চলে। মিথ্যেবাদীও। অর্থগৃধ্নু তো বটেই। ছলা কলা চাতুরীতে বেশ দক্ষ। নির্লজ্জ। এ সব মেনেও অলকাকে তিনি কিছুতেই জীবন থেকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। অথচ ভালবাসা—কামজ ভালবাসা-কতই না ফঙ্গবেনে জিনিস। হয়তো একটা মুখের একটু ডৌল, একখানা জুড-মতো আঁচিল, চোখের সামান্য হেরফের, এরকমই কোনও তুচ্ছ সামান্য নশ্বর ও পরিবর্তনশীল কারণে পুরুষের বুক মথিত হয়ে ভলকে ভলকে ভালবাসা চলকে ওঠে। এর কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু এ তো যুক্তির কথা। তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী হল অবুঝ, অন্ধ, অবিমৃশ্যকারী এক ভালবাসা।

মৃগাঙ্ক পাশে বসে অলকার হাঁটুতে গোঁজা নতমুখ তোলার চেষ্টা করতে করতে ফের একটু আবেগকম্পিত গলায় জিজ্ঞেস করেন, কেন কাঁদছো?

কান্নায় কাঁপা কাঁপা ধরা গলায় অলকা বলল, আমি আপনাদের কী ক্ষতি করেছি বলুন তো। কেন আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

কে তাড়াচ্ছে তোমাকে?

দীনেশবাবু আজই বলেছেন, আমি যেন আর না আসি।

মৃগাঙ্ক অলকাকে মায়াভরে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, দীনেশ কি রকম পাগল তুমি তো জানো। ওর কথা অত সিরিয়াসলি নিও না। আমি ওকে বলেছি যেন তোমাকে না তাড়ায়। আমি তোমার ব্যবস্থা করব।

অলকা জলে ভাসা মুখ তুলে মৃগাঙ্কর মুখে শ্বাস ফেলে বলল, কি রকম ব্যবস্থা?

কিছু একটা হবে। আমার কি রকম বিপদ যাচ্ছে জানো তো। এখন মাথার ঠিক নেই। তবে দীনেশ যাই করুক আমি তোমাকে ছাড়ব না। ভয় নেই।

আমাকে ছুঁয়ে বলুন।

ছুঁয়েই তো রয়েছি। এ কি ছোঁয়া নয়?

অলকা কান্নাভরা মুখেও একটু হেসে ফেলে, মা শীতলার দিব্যি রইল কিন্তু।

মা শীতলার দিব্যি কেন?

আমি যে খুব মানি।

আমার কথার দাম ওসব বিদ্যি-টিব্যির চেয়ে ঢের বেশী।

নিজেকে মৃগাঙ্কর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে অবাধে ছেড়ে দিয়ে অলকা বলল, বলুন না কী ব্যবস্থা করবেন।

একটা কিছু হবে।

আমি কি অবস্থার মধ্যে বেঁচে আছি যদি জানতেন! দীনেশবাবু তো আপনাকে বলেছেন যে আমার একজন স্বামী আছে! বলেননি?

বলেছে। তাতে কী? সেটা তুমি আগেই বলে দিতে পারতে।

অলকা ম্লান গলায় বলে, আছে না থাকার মতোই। হার্ট খারাপ, তার ওপর ভীষণ মদের নেশা। ডাক্তার বলেছে, অ্যালকোহলিক। লিভার ভাল নয়। ভীষণ খিটখিটে, বদমেজাজী।

তার জন্যই কি তোমার পেস মেকার দরকার?

হ্যাঁ।

লোকটাকে কি তুমি খুব ভালবাসো অলকা?

না। ভালবাসার মতো লোকই যে নয়। আমার পিঠে একটা দাগ দেখতে পাবেন। আজই

মোটা একটা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে মেরেছে আচমকা।

ইস! মারেও নাকি?

মার খায়ও। গায়ে তো একরত্তি শক্তি নেই। আজ যখন কুটনো কুটছিলুম তখন সারাক্ষণ খানকী-টানকী বলে গাল দিচ্ছিল, ওসব আমার গা-সওয়া, তারপর হঠাৎ মারল। আমারও এমন রাগ হল বঁটিটা তুলে উল্টো পিঠ দিয়ে দুটো ঘা বসিয়েছি কনুই আর হাঁটুতে।

রোগা মানুষকে উল্টে মারতে গেলে কেন?

সেইজন্যই তো মনটা খারাপ। তার ওপর দীনেশবাবু আজ এমন করে বললেন।

তোমার স্বামীর বুকে পেস মেকার বসালে কী হবে অলকা?

কী আর হবে। লোকটা খুব বাঁচতে চায়। মদ খাবে, শরীরের ওপর অত্যাচার করবে, আবার বাঁচতেও চাইবে। শরীর-টরীর বেশী খারাপ হলে ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। তখন মায়া হয়। পোষা জীবের ওপর যেমন মায়া হয় তেমনি। দীনেশবাবু আজ অবশ্য বলেছেন টাকাটা উনি দিয়ে দেবেন।

উনি একা না অলকা আমিও দেবো। ওটা নিয়ে ভেবো না। যতদিন পারো লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখো।

বেশীদিন বাঁচবে না। তারপর কী যে হবে আমার গতি। হয়তো বাজারের মেয়ে হয়ে যাবো। মাগো! ভাবতেও ভয় করে।

মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লেন, না। আমি যা বলি তা করি। তুমি বিপদে পড়বে না। শুধু একটা কথা—

কী কথা?

আমার স্ত্রীর আয়ু ফুরিয়ে আসছে, জানো তো!

জানি। মনটা সেজন্যও খারাপ লাগে।

ও মারা গেলে আমি খুব একা হয়ে যাবো।

তা তো ঠিকই। আমার অমন অপদার্থ স্বামী, সে মরে গেলেও আমি ভীষণ একা হয়ে যাবো।

আমি চাই, তুমি আমাকে একা হতে দিও না।

অলকা একটু অবাক হয়ে বলে, সঙ্গে রাখবেন?

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বলেন, না। সে উপায় নেই। তবে এমন কিছু করা যাবে যাতে রোজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়।

সত্যি করবেন ব্যবস্থা?

নিজের স্বার্থেই করব। কিন্তু তুমি আর কোনও পুরুষের সঙ্গে মিশতে যেও না।

অলকা আবার মুখ নোয়াল। একটু বাদে বলল, কোনও মেয়েই কি বারো ভাতার চায়? কেউ চায় না। কিন্তু কী যে হয়ে যায় ঘটনাচক্রে।

জানি। আমি তোমার কাছে সতীত্ব-টতীত্ব আশা করি না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য আশা করি।

অত শক্ত কথা বুঝি না যে। তবে মা শীতলার নামে দিব্যি করছি, আপনি ছাড়া আর কাউকে—

আবার দিব্যি? ওসবের কোনও দাম নেই। দিব্যি করতে হবে না। শুধু কথাটা মনে রাখলেই হবে।

আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না, কি করেই বা করবেন। দীনেশবাবুর সঙ্গে, আপনার সঙ্গে—। কিন্তু সে কি আমার দোষ? আপনারাই যে আমাকে ভাগ করে নিলেন!

সে তো বটেই। পৃথিবীর অধিকাংশ মেয়েই খারাপ হয় পুরুষের দোষে।

অলকা একরকম মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, জানেন, যাদের অনেক টাকা আছে তারা কিন্তু বেশী ভাল হয় না। আপনি কিন্তু খুব ভাল।

ভাল! বলে মৃগাঙ্ক হাসলেন, যারা ভাল তাদের কি মেয়েমানুষের দোষ থাকে?

অলকা খুব সরলভাবে বলে, দোষই যদি হবে তাহলে ভগবান দু'রকম তৈরি করলেন কেন? একটাকে ছাড়া আর একটার কেন চলে না?

মৃগাঙ্ক হঠাৎ বললেন, কেন, চলবে না কেন? কালোবাবাকে দেখছ না, ওর তো মেয়েমানুষের

দরকার নেই।

সাধু সন্ন্যাসীদের কথা কি এর মধ্যে আনতে আছে?

কালোবাবা কি সাধু, অলকা?

কেন বলুন তো! সাধু না হলে দীনেশবাবু গুরু করতেন ওঁকে!

তাহলে তুমি ওর ঘরে রাত্রে যাও কেন?

অলকা নতমুখ হল। তারপর মুখ তুলে বলল, রোজ যাই এমন নয়। দু'দিন যেতে হয়েছিল ইচ্ছে করে নয় কিন্তু। দীনেশবাবু পাঁচশো টাকা হাতে দিয়ে বললেন, যদি লোকটাকে নষ্ট করতে পারো তো আরো পাঁচশো দেবো। আমি প্রথমটায় রাজি হইনি জানেন। সাধু-টাধুদের ভীষণ ভয় লাগে। কিন্তু দীনেশবাবু ছাড়লেন না। চাপাচাপি করতে লাগলেন।

ভয়ে আর টাকার লোভে অলকা?

বড্ড সস্তা হয়ে গেছি যে আপনাদের কাছে।

তারপর কী হল?

বললুম তো, সাধু সন্ত লোক কি এই ফাঁদে ধরা দেয়?

তুমি বোধহয় চেষ্টাও করোনি?

অলকা একটু হাসল, কি করে বুঝলেন?

তুমি খুব ধর্মভীরু।

আবার গোলমেলে কথা! ধর্মভীরুরা কি আমার মতো নষ্ট পায়?

নষ্ট পায় বলেই তো—ভগবান ভগবান করে। কিন্তু আজ বড় বেশী কথা হচ্ছে আমাদের।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে আমার। আপনি ভীষণ ভাল।

আর দীনেশ?

দীনেশবাবু! ও বাবা! ওঁর শুধু একটা শরীর দরকার, আর কিছু নয়। দীনেশবাবুর মন বলে কিছু নেই।

মৃগাঙ্ক মৃদুস্বরে বলেন, আছে। না থাকলে এতকাল ধরে আমরা বন্ধু থাকতে পারতাম না।

দীনেশবাবুর মেজাজটা খুব দিলদরিয়া। তবু আপনার মতো নন।

আমি কি রকম অলকা? মন-রাখা কথা বোলো না, সত্যিই কি রকম?

অলকা লজ্জায় দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে রইল কিছুক্ষণ। যখন হাত সরাল তখন ওর মুখ ঝলমল করছে লাজুক ও মিষ্টি হাসিতে। বলল, আপনি ভীষণ ভাল, বলেছি তো!

ভাল কথাটা ভীষণ গোলমেলে। ভাল বলতে বোকা বোঝায়, ম্যাদামারা বোঝায়, অপদার্থ বোঝায়।

আপনি মোটেই বোকা নন। বোকা হলে কেউ এত বড়লোক হতে পারে?

এই সরল উক্তিতে মৃগাঙ্ক করুণ মুখে হাসলো। আজ তাঁর মনটা ভাল নেই। দীনেশ কী একটা অদ্ভুত কথা বলল! যদি আজ কল্পনা মারা যায়! মৃগাঙ্ক একবার ঘড়ি দেখলেন। আজ বলতে যদি রাত বারোটা হয় তাহলে এখনো ঘন্টা চারেক সময় আছে।

ঘড়ি দেখছেন কেন? তাড়া আছে নাকি?

না, তাড়া কিসের?

আপনি আজ ভারী আনমনা। আমার দিকে মন দিচ্ছেন না!

তাই বুঝি?

এই বলে মৃগাঙ্ক অন্য সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে অলকার প্রতি মন দিলেন। তারপর অলকার শরীর নৌকোর মতো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

শরীর একসময়ে শেষ হল। ক্লান্তির পর এই সময়ে মৃগাঙ্ক রোজই একটু পান করেন। বাইরের ঘরে অলকা আর মৃগাঙ্ক যখন পানপাত্র হাতে বসেছেন তখনই যদু এল। কল্পনার অবস্থা খারাপ। যেতে হবে।

বেঁচে থাকার এই কতগুলো হ্যাপা আছে। এই হ্যাপাগুলো তিনি কোনোদিন পছন্দ করেন না। রোগ, ভোগ, মৃত্যু, বিপদ, ভয়। এই একটা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দীনেশের খুব মিল। কিন্তু দীনেশ বিয়ে-টিয়ে করেনি বলে অনেকটা এড়াতে পারে। মৃগাঙ্ক পারেন না।

নার্সিং হোমের ফটকের কাছেই সুমিত দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ শুকনো।

কী রে?

হয়ে গেছে।

তার মানে?

সুমিত মাথা নাড়ল, মিনিট কুড়ি পঁচিশ আগে।

মৃগাঙ্কর বুকটায় একটা দুর্বোধ্য ব্যথা উঠল। তিনি ককিয়ে উঠলেন, উঃ!

বুকে হাত চেপে ধরে একটু টাল খেতেই দুটো শক্ত হাত তাঁকে ধরল। যদু। তিনি কিছুক্ষণ শ্বাসের কষ্ট টের পেলেন। শরীরটা কাঁপছেও।

আপনি চলুন, লাউঞ্জে একটু বসবেন।

যদুর কাঁধে হাত রেখে মৃগাঙ্ক এসে লাউঞ্জে বসলেন। চোখটায় একটু আবছা দেখছেন। ঘটনাটা ঠিক ভিতরে ঢুকতে চাইছে না। পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেল।

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই নার্সিং হোম-এর লাউঞ্জ প্রায় ভরে গেল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর চেনাজানা লোকজনে। মৃগাঙ্ক খুব যে শোক বোধ করছিলেন তা নয়। কেমন যেন ফাঁকা লাগছে। ভাল লাগছে না।

শরীরটা অবশ্য তার গোলমাল করল না। তিনি মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে একটা হিসেব করছিলেন। কল্পনা যখন মারা যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তিনি অলকার শরীরে ডুবে আছেন। অদ্ভুত একটা নাটকীয়তা, তাই না? অদ্ভুত। কল্পনার শেষ শ্বাস যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তার স্বামী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে পরনারী গমন করে। এটা কি পাপ হল?

ভীড়ের মধ্যে দীনেশকে দেখা গেল। সঙ্গে কালোবাবা।

দীনেশ কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল। বলল, এ ভালই হল। কষ্ট পাচ্ছিল।

মৃগাঙ্কর মনে পড়ল, দীনেশ বলেছিল, কল্পনা যদি আজ মারা যায়—, আজই তো গেল!

মৃগাঙ্ক মুখ তুলে বললেন, তুই সন্ধেবেলা একটা কথা বলেছিলি—

দীনেশ কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বলল, ওসব কথা পরে হবে, এখন নয়।

মৃগাঙ্ক কেমন একটা শীতলতা অনুভব করলেন। একটা অজানা ভয় বুকে ডুগডুগি বাজিয়ে গেল কিছুক্ষণ।

ঘটনাটা ঘটবারই কথা ছিল। ঘটল। কিন্তু আজই কেন? কল্পনা তো যাই-যাই করেও বেঁচে ছিল এতদিন! আজই কেন?

কালোবাবা পাশেই বসলেন। গলা খাঁকারি দিলেন কিছু বলার জন্য। কী বলবেন বোধহয় ভেবে পাচ্ছিলেন না।

মৃগাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বড্ড একা হয়ে গেলাম।

কালোবাবা মাথাটা দুঃখিত ভাবে নাড়লেন।

মৃগাঙ্ক একটা কূট সন্দেহে কালোবাবার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আপনি কি আগে থেকেই জানতেন যে কল্পনা আজ মারা যাবে?

কালোবাবা মাথা নেড়ে বললেন, আমি ওসব জানি না বাবা। আমার কোনও ক্ষমতা নেই।

তাহলে দীনেশ কি করে জানল?

আমি কিছু জানি না।

।। ছয় ।।

ভগবান মানুষকে নানা ক্ষমতা দেন। হয়তো শয়তানও দেয়। ঝন্টুর একটা ক্ষমতা হল, কাছাকাছি টাকা থাকলে সে টের পায়। গন্ধই পায় হয়তো। কিন্তু টাকার খবরটা তার কাছে চাপা থাকে না।

প্রথম যে ব্যাপারটা টের পেল, যখন এক রাতে বাড়ি ফিরেই সে দেখল, ঘরে তার মা বোন আর সবচেয়ে ছোট ভাই পল্টু কী নিয়ে চাপা গলায় উত্তেজিত আলোচনা করছে। তাকে দেখেই থেমে গেল সবাই। কেউ তার চোখে চোখ রাখল না সেই রাতে। তার পরদিন সে কয়েকবারই আড়ালের ফিসফাস টের পেল। একটু সজাগ আর উৎকর্ণ রইল সে। একবার শুনতে পেল তার মা বলে উঠল, অত টাকা কোথায় পেল তোর বাবা?

ব্যস, ঝন্টু নিশ্চিন্ত। বিশেষ খুঁজতেও হল না তাকে। এ বাড়ি এমনই ছন্নছাড়া যে লুকোবার বেশী জায়গাও নেই। মাটির ঘরের মেঝেতে একটু লক্ষ করতেই সে চৌকির তলায় সদ্য লেপা একটা জায়গার উঁচুনিচু ভাব ধরে ফেলল। ওর নিচে মাটির হাঁড়িতেই যা থাকবার আছে।

ঝন্টু তাড়াহুড়ো করল না। কয়েকটা দিন যেতে দিল। টাকাটার পালানোর পথ নেই। ওর গায়ে ঝন্টুর নাম লেখা হয়ে গেছে। দু'দিন বাদে তার মা বিছানা ছেড়ে উঠল। বলল, আজ শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। আজ আমি রাঁধব। মায়ের শরীর ভাল দেখে মনুর আহ্লাদ হল। বহুকাল সে বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করেনি, গুটি খেলেনি, হৃদয়ের জমা কথা উজাড় করেনি। মনু তাই গেল পাড়া বেড়াতে। মন্টু একটা আধা-চাকরি পেয়েছে। মনীশবাবু নামে একটা লোক মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন বের করছে, মন্টু তার দলে ভিড়ে গেছে। ক'দিন হল সে বাড়িতে নেই। পল্টু পড়তে যায়। বেলা এগারোটা নাগাদ ঝন্টু টাকাটা বের করে ফেলল। গোনার সময় নেই। টাকা পকেটে পুরে গর্ত বুজিয়ে তাড়াতাড়িতে যতদূর সম্ভব মাটি চেপে চৌরস করে দিল জায়গাটা। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

কলকাতায় নেমেই সে আগে একটা রেস্টুরেন্টে বসে চপ কাটলেট খেল। তারপর পান খেল, এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই কিনল। কয়েকটা দোকান ঘুরে পছন্দসই একটা টেরিকটনের প্যান্ট আর লাল ডোরাকাটা জামা কিনল। তারপর একজোড়া চটি। এরপর সে একটা হিন্দি সিনেমা দেখল ইভনিং শোয়ে।

রাত কাটানোটা একটা সমস্যা বটে। হোটেলেই থাকবে ভেবেছিল কিন্তু শিয়ালদার কাছে কয়েকটা হোটেলে ঘুরে দেখল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার নিচে ঘর নেই। এক রাতের জন্য অত টাকা খরচ করার কথা দু'হাজার টাকার মালিকও ভাবতে পারে না। তাও শুধু থাকা, খাওয়ার জন্য উপরি চাই।

কলকাতা শহরটা তার চেনা হলেও দিনের চেনা। রাতের চেনা নয়। যত রাত বাড়বে ততই এই শহর তার কাছে অচিনপুর হয়ে যাবে। দোকানপাট ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে, ঘরে ঘরে বাতি নিবেছে, রাস্তার ভীড় কমে যাচ্ছে, চারদিকে শেয়ালের মতো নানা মতলবের চোখ ঝিলিক মারতে লেগেছে।

ঝন্টুর একটু ভয় হল। বিনি মাগনা রাতের একটা ঠেক জোগাড় হয়ে গেলে দিনের বেলার তার আরও অনেক ফূর্তি করার কথা। খুব সাহস করলে একটা কাজ করা যায়। টাকাটা সে যে সরিয়েছে এটা তার বাবা নিশ্চয়ই এখনো জানে না। অতদূর থেকে খবরটা আজকের মধ্যেই এসে পৌঁছোনোর কথা নয়। সুতরাং আজ রাতটা সে বাবার কাছে কাটিয়ে দিতে পারে।

ঝন্টু বাসে উঠে পড়ল। জায়গামতো যখন পৌঁছোলো তখন বেশ রাত হয়েছে। বাড়িটা বেশ নিঃঝুম লাগছে।

ফটকে দারোয়ান পথ আটকে বলল, কোথায় যাবেন?

আমার বাবা এ বাড়িতে কাজ করে। তার নাম যদু।

দারোয়ান মাথা নেড়ে বলল, দেখা হবে না। এ বাড়ির কর্ত্রী মারা গেছেন। শ্মশানে যাবে। ডেডবডি আসছে।

খবরটা ভালই। যতই গণ্ডগোলের বাজার ঝন্টুর পক্ষে ততই ভাল। সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, কিন্তু আমার যে গাঁয়ে ফেরার উপায় নেই। শেষ ট্রেন চলে গেছে। আমি এখানে থাকব বলে এসেছিলাম।

দারোয়ান একটু নরম হয়ে বলে, এখানে কোথায় থাকবে? তোমার বাবার ঘর তো তালা দেওয়া। এখন সব ভীড় হয়ে যাবে বাড়িতে।

আমি তাহলে একটু ওই সিঁড়িতে বসি। বাবা আসুক।

দারোয়ান চিন্তিত গলায় বলল, সদরের সিঁড়িতে নয়। বরং ভিতরের সিঁড়ির নিচে বোসো গিয়ে।

ঝন্টু ভারী নিশ্চিন্ত হল। যাহোক, রাতটা কাটানো নিয়ে কথা। সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে বসে সে খুব আরামে একটা সিগারেট টানল। তারপর বসে বসে ঝিমোতে লাগল।

রাত একটা দেড়টা নাগাদ নানা গলার আওয়াজে ঘুমটা ভাঙল ঝন্টুর। ডেডবডি এসেছে।

বাইরে খুব কীর্তন হচ্ছে।

শক্ত দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় ঘাড়ে একটা ব্যথা হয়েছে। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে ঠাণ্ডায়। একটু লেপটেপ বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুলে হত।

যদু বাইরেই ছিল। ঝন্টু বেরিয়ে গিয়ে তার বাবাকে ধরল, বাবা!

যদু আপাদমস্তক চমকে উঠে বলল, তুই! কোনও খবর আছে নাকি?

ঝন্টু মাথা নেড়ে বলল, না। মায়ের জন্য একটা ওষুধ কিনতে আসতে হল।

কী ওষুধ?

ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছে। তবে পাওয়া যায়নি। শেষ ট্রেনটা ধরতে পারলাম না।

যদু তটস্থ হয়ে বলল, রাতে থাকবি নাকি?

আর কোথায় যাবো? তোমার ঘরের চাবিটা দাও।

যদু যেন সাপ দেখেছে এরকম আঁতকে উঠে বলল, চাবি? না না, চাবি কেন? চাবি কিসের দরকার?

ঘুমোবো। এতক্ষণ সিঁড়ির তলায় বসে ঘুমোচ্ছিলাম, ঠাণ্ডা লাগছে।

ওখানেই শুয়ে থাক।

তোমার ঘরে শুলে দোষ হবে নাকি?

বাবুদের বারণ আছে।

ঝন্টু আর যাই হোক, বোকা নয়। সে তার বাপ যদুর চেহারাটা ভাল দেখছিল না। রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রংটাও যেন কেমন ফ্যাকাসে। চোখের মধ্যে কেমন একটা জুলজুলে চাউনি। না, লক্ষণ মোটেই ভাল নয়। তাছাড়া দরজায় একটা ঝাঁ-চকচকে দামী তালাই বা ঝুলবে কেন? তার বাপ যদুর এমন কিছু টাকাপয়সা সোনাদানা থাকার কথাই নয়। তাই ঝন্টু দুইয়ে দুইয়ে চার করে নিল চোখের পলকে। পল্টুর হাত দিয়ে দু'হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে বাড়িতে। তাহলে ওই দু'হাজারই শেষ নয়। ঘরে আরও মালকড়ি আছে। ঝন্টু টাকার গন্ধ পায়। এখন পাচ্ছে।

লোকজনের ব্যস্ত ভীড়, আত্মীয়স্বজনের আনাগোনায় শোকের বাড়িতে এখন কেউ কারও নয়। পাড়ার লোকেরা ঘুম থেকে উঠে এসেছে মড়া দেখতে। বাইরেই শোয়ানো। মেলা ফুলটুল দিয়ে সাজানো খাট। কীর্তন চলছে।

ভীড় ছেড়ে একটু তফাতে বাপ-ব্যাটায় দাঁড়ানো। ঝন্টুর আগমনে ভারী অস্বস্তি বোধ করছে যদু। রেগেও যাচ্ছে। ঝন্টুকে সে পছন্দ করে না।

যদু বিরক্ত গলায় বলল, এত রাত করা তোর ঠিক হয়নি।

ঝন্টু বাপকে চটাতে চায় না। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, অনেক ঘুরতে হল যে। শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ।

এমন কি ওষুধ যে কলকাতায় পাওয়া যায় না? প্রেসক্রিপশনটা দে তো, আমি কিনে পাঠিয়ে দেবো।

ঝন্টু বলল, প্রেসক্রিপশনটা একটা দোকানে জমা আছে। বলল কাল আনিয়ে দেবে।

যদু শহরের লোক। ওষুধ-বিষুধ তাকে গত কয়েকমাস মেলা কিনতে হয়েছে। কোনও দোকান প্রেসক্রিপশন রেখে দেয়, এমনটা বড় একটা ঘটে না। ঝন্টুকে সে মোটামুটি চেনে।

ছেলের দিকে চেয়ে সে বলল, কোন দোকান?

সে এসপ্লানেডে।

দোকানের নাম আছে তো একটা।

নামটা মনে নেই।

দোকানটা চিনতে পারবি তো।

হ্যাঁ, খুব চিনব।

তাহলে কাল সকালে আমার সঙ্গে যাস। কিনে দিয়ে দেবো। এখন গিয়ে সিঁড়ির তলায় শুয়ে থাক। আমাকে শ্মশানে যেতে হবে।

ঝন্টু এই প্রস্তাবে দুঃখিত হল না। সে অপেক্ষা করতে জানে। আর এও জানে, ধৈর্য ধরলে

সুযোগ আসবেই। তবে মুশকিল হল, তার বাপ তাকে বিশ্বাস করছে না। কাল সকালে যদি সত্যিই দোকানে যেতে চায় তাহলে বিপদ আছে। ঝন্টু চালাক বটে, কিন্তু যদুও যে বোকা লোক নয় তা সে হাড়ে হাড়ে জানে।

এবাড়িতে ঝন্টু বহুবার টাকা নিতে এসেছে। আগে সে আসত, পরে আসত মন্টু। টাকার হিসেব নিয়ে গোলমাল হতে শুরু করায় প্রথমে ঝন্টু আর পরে মন্টুকে একাজ থেকে সরানো হল। আজকাল পল্টু আসছে। আজকাল টাকাও বেড়েছে, তার বাপ যদু চাকরি পেয়েছে কিনা।

মড়া নিয়ে শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে তার বাবাও গেছে হয়ে গেল। ঝন্টু গিয়ে ফের সিঁড়ির তলায় বসে একটা সিগারেট ধরাল।

দারোয়ান এসে তাকে দেখে বলল, আরে! তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি?

হয়েছে।

তাহলে এখানে বসে আছো কেন? ঘরে শুলেই তো হত।

ঝন্টু একটু দ্বিধা করে সত্যি কথাটাই বলে ফেলল, বাবা চাবি দিল না। বলল, ঘরে শুতে বাবুদের মানা আছে।

সিকিউরিটির খাকি পোশাক পরা দারোয়ান বিস্মিত হয়ে বলল, মানা কিসের? অন্য ঘর তো নয়, যদুদারই ঘর। তালা দেওয়ারই কোনও মানে হয় না। চব্বিশ ঘন্টা পাহারা থাকছে।

তাই তো দেখছি।

কম্বল-টম্বল কিছু নেই?

না।

তোমার খুব কষ্ট হবে।

খুব কষ্ট, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পিঠ ব্যথা করছে।

দারোয়ানকে একটা সিগারেট দেবে বলে ভেবেছিল ঝন্টু। তবে বুদ্ধি করে দিল না। সিগারেট দিলেই কথায় কথায় আড্ডা হবে। সে আড্ডা দিতে চাইছে না। দারোয়ান সদর বন্ধ করলে সে একবার তার বাবার ঘরের দরজাটা পরখ করবে।

দারোয়ান আরও দু-চারটে কথার পর বাইরে গিয়ে সদর বন্ধ করে দিল। ঝন্টু উঠে পড়ল। দরজার হ্যাসবোল্ট আর তালা নেড়েচেড়ে দেখল সে। ভাঙার সহজ উপায় নেই। তালা যেমন মজবুত, হ্যাসবোল্টও তেমনি পোক্ত। ঝন্টুর কাছে যন্ত্রপাতিও কিছু নেই। খুঁজতে খুঁজতে সে ছাদে উঠল। ঘুরে ঘুরে পেল একটা পুরোনো টিভি অ্যান্টেনার আধখানা রড। নেমে এসে সেইটে দিয়ে চেষ্টা করল হ্যাসবোল্টে চার মেরে খুলে ফেলতে। হল না। বরং পালিশের দরজাটায় বিশ্রী দাগ পড়ে গেল। যদু বুঝে ফেলবে যে, দরজা ভাঙার চেষ্টা হয়েছিল।

এই শীতের রাতে যে বাপ ছেলেকে সিঁড়ির নিচে শোওয়ার পরামর্শ দেয় সেই বাপ কি বাপ? না সে বাপ নয়। সে হল গণ্ডগোলের লোক।

যদুর দরজার বাইরে একটা পাপোষ রয়েছে, বেশ পুরু, সেইটে সিঁড়ির নিচে টেনে আনল ঝন্টু। উল্টে নিয়ে তার ওপর শোওয়ার চেষ্টা করল। একে তো তার শরীরের আধখানাও আঁটছে না, তার ওপর আবার কুটকুটে। জামা প্যান্টের প্যাকেট দুটো বালিশের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করল। কিন্তু তেমন সুবিধে হল না।

আজকেই যা একটু সুযোগ ছিল। কাল আর এমন মওকা পাওয়া যাবে না। গাঁ থেকে টাকা-চুরির খবর কাল সকালেই হয়তো চলে আসতে পারে। তার ওপর ওষুধ কেনার ভাঁওতা আছে। ঝন্টুর প্যান্টের পকেটে দু'হাজার টাকার অনেকটাই অবশিষ্ট আছে। ধরা পড়তে কতক্ষণ?

ঝন্টু ফের উঠে রডটা দিয়ে দরজা খুলবার চেষ্টা করল। হল না। পাতলা লোহার চাদরে তৈরি পুরোনো রডটা বেঁকে গেল। দরজায় পড়ল আরও কয়েকটা দাগ।

হতাশ হয়ে ঝন্টু সিঁড়ির নিচে শুয়ে তার বাপ কিভাবে টাকাটা রোজগার করল তা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

শাসনের মাথায় এখন চিন্তার বাসা। অবশ্য তার মাথা খুব ঠাণ্ডা। বিপদে সে অধীর হয় না। তার বোধবুদ্ধি নির্ভুল কাজ করে।

যেদিন রাতে মনীশ এসে সাতগড়ের ঢিবির খবর দিয়েছিল সেই রাতেই শাসন হরিহরের বাসায় যায়।

বাপু হে, হরিহর, একটি কাজ করিতে হইবে। খুব গোপনীয়।

বংশবদ হরিহর বলল, বলুন না, হয়ে যাবে।

পারিবে তো! কাজটি নষ্ট হইবে না।

বদমাইশি করে করে চুল পাকিয়ে ফেললুম, কী এমন কাজ?

চুরি। যথাসাধ্য মজুরী পাইবে। মনীশবাবুর ক্যাম্পটি কি চেনো?

তা না চিনবার কী? বাবু তো গুপ্তধন খুঁজছেন। সাতঘড়া মোহর বেরোবে মাটির তলা থেকে। সবাই জানে, নজরও রাখছে।

এখনও মোহর বাহির হয় নাই। তবে যতগুলো অকাজের দ্রব্য বাহির হইয়াছে, সেগুলি আমার চাই।

কত দেবেন?

দুইশত টাকা। কাজটি দীনেশবাবুর মনে রাখিয়া সন্তর্পণে উদ্ধার করা চাই।

দীনেশবাবুর নামে এখনও এই গ্রামে কিছু কাজ উদ্ধার হয়। তিনি এখানে থাকেন না বটে, কিন্তু এক সময়ে তাঁরাই ছিলেন এই সব জায়গার মালিক। উপরন্তু দীনেশবাবুর উগ্র স্বভাব, বেপরোয়া ভাব ইত্যাদির জন্যও কিছু লোক তাকে সমীহ করে।

হরিহর মাথা নেড়ে বলল, করে দেবো। দিনকাল খারাপ পড়ে গেছে শাসনবাবু। ঘরে এখন আর কেউ কিছু রাখে না। কখনও কখনও চাল-গম-শাড়ি-গামছাও চুরি করতে হয়। একটা গাঁইটের দাম উপরি পাবো তো!

দিব. তবে আর বেশী চাপাচাপি করিও না।

শেষ রাতে হরিহর জিনিসগুলি পৌঁছে দিল। তবে কাঁচমাচু মুখে বলল, একটু গোলমাল হয়ে গেল।

শাসন চমকে উঠে বলল, কী গোলমাল?

গোলমাল মানে একেবারে খুনখারাবি নয়। তবে জান বাঁচাতে একটু ডাণ্ডা চালাতে হল।

কী সর্বনাশ! কাহাকে মারিলে?

আর সব শালা তো ভেড়ুয়া। কেউ কিছু বলত না। হরিহরকে তারা ভালই চেনে। তবে মনীশবাবুর তাঁবুর মধ্যেই ছিল তো জিনিসগুলো। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। 'কে কে' বলে তেড়ে উঠতেই ছোরা দেখালাম। বললাম, চেঁচালে ভুকিয়ে দেবো। কিন্তু বিটকেল লোকটা একটা ভাল্লুকের মতো এসে এমন চেপে ধরল!

তাহার পর কী হইল?

হরিহর মাথা চুলকে লাজুক মুখে বলল, শুনলে আপনি রাগ করবেন। ছোরাটা একটু চালাতে হয়েছিল। তবে বেশী নয়। কনুইতে একটু চিরে গেছে বোধ হয়। তবু ছাড়ে না। যা চিল্লামিল্লি করছিল, আর একটু হলে গাঁয়ের লোক জড়ো হয়ে বাঁশপেটা করে মারত আমায়।

তাহার পর তুমি কী করিলে?

তখনই মাথায় মারতে হল। তাও কি ছাড়ে? গোটা তিনেক খেয়ে তবে বাবু মাটিতে পড়লেন। সাংঘাতিক লোক।

শাসন ভারী হতাশ হয়ে বলল, তোমাকে চিনিতে পারেন নাই তো!

চিনতে না পারলেও টর্চের আলোয় মুখটা দেখে রেখেছেন।

কাজটি বোধহয় পণ্ডই হইল হে হরিহর। আর কেহ দেখিয়াছে কি?

যদুর ছেলে মন্টু দেখেছে। লেবারারদেরও দু-একজন লোক দেখেছে। তবে তারা টুঁ শব্দটি করবে না।

ভোরবেলা মনীশের আসার কথা ছিল; এল না। শাসন পরম্পরায় খোঁজ নিয়ে জানল, মনীশের মাথায় গভীর ক্ষত হয়েছে, হাতেরও অনেকটা কেটেছে। রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। গাঁয়ের ডাক্তার ঠিক করতে পারেনি, সরঞ্জাম নেই বলে শুধু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মনীশ তার ক্যাম্পে পড়ে আছে। কলকাতায় যাওয়ার পরামর্শে সে কর্ণপাত করেনি।

লক্ষণটা ভাল ঠেকছে না শাসনের। সে লোকচরিত্র জানে। মনীশ এমনিতে সাদামাটা নিরীহ-দর্শন হলেও ওর মধ্যে একটু লুকোনো আগুন থাকতেও পারে। সেটাকে খুঁচিয়ে তোলা উচিত কাজ নয়।

ক'দিন ধরেই মনীশের খননকার্যে পাওয়া জিনিসগুলি বিরলে বসে দেখেছে শাসন। গুটি কয়েক ধাতুপাত্র, একটা অষ্টধাতুর নারায়ণ মূর্তি, যুগল লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তি, কিছু বাসনপত্র, এক দেড় হাজার বছরের পুরনো তো হবেই। টাকায় এর দাম হয় না। শাসন জিনিসগুলিকে আদর করে আর তার মন মায়ায় ভরে যায়। প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে লগ্ন আছে বিচিত্র ইতিহাস। ঘটনাবলী, মনুষ্যচরিত্র, যথাসাধ্য শিল্পকর্ম।

।। সাত ।।

পরাজয় কাকে বলে তা মনীশ ভালই জানে। সাতগড়ের ঢিবি খুঁড়বার জন্য সে প্রলুব্ধ হয়েছিল শাসনের কথায়। সে সাত-পাঁচ ভাবেনি। এই বিচিত্র বিকিকিনির ব্যবসাতে নামবার আগে সে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র। ভাল ছাত্র। তার ডিগ্রি তেমন কোনও কাজে লাগেনি। সাত ঘাটের জল খেয়ে তবে এই অদ্ভুত বেআইনী ব্যবসায় এসে পড়ল। নিজের ইচ্ছেয় নয়। তবে তার নীতিবোধ তেমন প্রবল হতে পারেনি অবস্থার চাপে। এবং সে এও জানে যে, এই পোড়া দেশে প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাদ্রব্যের না আছে তেমন সমাদর, না তেমন সংরক্ষণ। বরং বেসরকারী সংগ্রাহকরা কিনে নিয়ে যত্নে রাখবে। এটা যুক্তির কথা নয় বটে, কিন্তু নীতিবোধ বিসর্জন দেওয়ার জন্য চোরেরও কিছু অজুহাত থাকে, যেমন থাকে খুনীরও।

কিন্তু মনীশের ব্যবসা নিতান্তই গরীব ব্যবসা। তার সংগ্রহ এমন কিছু আহামরি নয়। খাটুনিও প্রচুর। প্রায় সময়েই বুনো মোষ তাড়ানোর মতো পণ্ডশ্রম হয়। লাভ থাকে সামান্যই। কিন্তু গাঁয়েগঞ্জে বিচিত্র জায়গায় ঘুরে ঘুরে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর। দেশটা সম্পর্কে আবছা ধারণা কেটে গিয়ে একটা বাস্তব বোধ এসেছে। এতকাল সে কোনও ঝুঁকি নেয়নি। তার বাধা খদ্দের মাত্র কয়েকজন। কম বেশী লাভ রেখে সে তাদের জিনিস বেঁচে দেয়। বেশী লোভ করে না। এবার করল।

সাতগড়ের ঢিবি খুঁড়তে টাকার দরকার ছিল। এই টাকাটা সংগ্রহ করতে হল মায়ের গয়না বন্ধক রেখে। ধারও করতে হল। লগ্নী করল, আর হাতেও কিছু রাখল। সব মিলিয়ে হাজার দশেকের মতো।

লগ্নীটা ভুল হয়নি। মোটামুটি সাত আট ফুট নিচেই কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যেতে লাগল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটতে শুরু করল নানা ঘটনা। কী করে রটে গেল যে সাতগড়ের ঢিবিতে গুপ্তধন আছে বলে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। ফলে বেশ কয়েকজন লোক শাবল কোদাল নিয়ে এসে আশেপাশে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল। নিশুত রাতে লণ্ঠন নিয়েও লোক আসতে লাগল মাটি খুঁড়তে। গাঁয়ের পলিটিক্সওলা কয়েকজন মাতব্বর এসে এক সকালে গম্ভীর মুখে মনীশকে নানা প্রশ্ন করল, কেন খুঁড়ছেন? কার পারমিশন নিয়েছেন? পঞ্চায়েতকে জানিয়েছেন কি না?

তারপর এল উটকো কিছু হামলাবাজ। লাঠিসোঁটা নিয়েই এল। স্পষ্টই বলল, এ জমি মোটেই দীনেশবাবুর নয়। তিনি কলকাতায় বসে পারমিশন দিলেই হয়ে গেল? প্রমাণ কোথায়? জমির আসল মালিক হল শ্রীকান্ত মণ্ডল।

একের পর এক ঝামেলায় নাজেহাল হতে লাগল মনীশ। অথচ কিছুতেও পারে না। অতগুলো টাকা তাহলে জলে যাবে। তবে বুঝতে পারছিল, দু'একদিনের মধ্যে তাকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। নইলে যা কিছু পেয়েছে সেগুলোও চলে যাবে। সেই সঙ্গে প্রাণও যেতে পারে।

লেবাররাও সুবিধের লোক নয়। নানা ছলছুতোয় মজুরী বাড়াতে চায়, চোখ না রাখলেই বসে বিড়ি টানে। কোদাল, গাঁইতি সাবধানে চালায় না বলে কিছু জিনিসের ক্ষতিও হয়েছে।

যে রাতে সে মোটামুটি ঠিক করে ফেলল যে, পরদিন কলকাতায় যাবে সে রাতেই তার তাঁবুতে চোর এল। দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে মনীশের ঘুম তেমন ভাল হয় না। এই শীতে তাঁবুর মধ্যে থাকার অভ্যাস নেই বলেও অস্বস্তি আছে। ফলে সামান্য শব্দেই চটকা ভাঙল। সে উঠে টর্চ জ্বালতেই দেখতে পেল, একটা লোক তার সদ্য লব্ধ জিনিসগুলি পোঁটলা বাঁধছে।

কে? কে তুমি?

লোকটা চোর বটে, কিন্তু ছিঁচকে নয়। পালাল না। একটা ছোড়া পট করে হাতে বাগিয়ে ধরে বলল, চেঁচাবেন না। ভুকিয়ে দেবো।

মনীশের তখন হার মানবার অবস্থা নয়। ওই জিনিসগুলো চলে গেলে তার সর্বস্ব যাবে, সে মরিয়া হয়ে গিয়ে ছোরার মুখেই লোকটাকে জাপটে ধরে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু লেবাররা কেউ এল না; চোরটা পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গিয়েই ছোরাটা চালাল মনীশের ডান হাতে। দরদর করে রক্ত পড়ছে। হাতের টর্চ ছিটকে গেছে আগেই। অন্ধকারে মনীশ শুধু ছায়া লক্ষ করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর সেই সময়ে ঠং করে তার মাথায় একটা শক্ত জিনিস সপাটে এসে পড়ল।

জ্ঞান যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল মনীশের তা নয়। কেমন যেন আবছা আবছা একটু চেতনাও ছিল। তার মধ্যেই সে টের পেল, তার সর্বস্ব লুঠ হয়ে যাচ্ছে। কিছু করার নেই। সে এই অবস্থাতেই নিজেকে টেনে তুলল। চোরকে লক্ষ করে নিজেকে একরকম নিক্ষেপ করল সে। কিন্তু এবার তার মাথায় পরপর আরও দুটো ঘা পড়ল, চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। চেতনা নিবে গেল।

যখন চেতনা ফিরল তখন ভোর হয়েছে। লেবারদের একজন ডাক্তার ডেকে এনেছে। হাঁটু গেড়ে সেই ডাক্তার তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিল।

মনীশকে ডাক্তার বললেন, স্টিচ করা দরকার। মাথায় তিন জায়গায় চামড়া হাঁ হয়ে গেছে। অনেক রক্ত গেছে। হাতের ক্ষতটাও ভাল নয়, কলকাতায় যেতে পারবেন?

মনীশ জবাব দিল না। গভীর হতাশা আর তিক্ততায় আর গ্লানিতে সে তখন ভরে আছে।

ডাক্তার বললেন, ক্ষত বিষিয়ে উঠতে পারে। আপনার ভাল চিকিৎসা দরকার। এখানে সেসব ব্যবস্থা হবে না। আজ-কালের মধ্যেই কলকাতা চলে যান।

মনীশ কোথাও গেল না। গেঁয়ো ডাক্তারের বাঁধা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে পড়ে রইল ক্যাম্পের বিছানায়। জ্ঞান আসার পরও যেন ঘোর লাগা এক অচৈতন্যের মতোই পড়ে রইল।

হিসেব নিকেশ এক সময়ে করতেই হল। চোর একটি পয়সাও রেখে যায়নি। নিয়ে গেছে সমস্ত পুরাদ্রব্য। টুকিটাকি কিছু জিনিসও। গেঞ্জী, একটা প্যান্ট, গোটা দুইটি শার্ট, জুতোজোড়া। দুজন লেবারারের পালা করে পাহারা দেওয়ার কথা থাকে রাতে। তাদের ডেকে পাঠাল মনীশ।

প্রথমটায় মনীশের মনে হল, তার জীবনে এখানেই দাঁড়ি টানা হয়ে গেছে। সামনে বন্ধ দেওয়াল। এত টাকার ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভবপর নয়।

দিন তিনেক সে উঠতে পারল না। প্রবল যন্ত্রণা চেপে শুয়ে রইল। খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ। লেবাররা মজুরী না পেয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও গজগজ করছে। চুরিটা হয়েছে তাদের দোষেই, নইলে চেঁচামেচি বাঁধিয়ে দিত।

পুলিশকে খবর পাঠায়নি মনীশ। সেটা তার পক্ষে বিপজ্জনক হবে। এখানে তাঁবু খাটিয়ে সে খোঁড়াখুঁড়ি করছে এটা পুলিশের চোখে খুব ভাল ঠেকবে না।

কিন্তু শেষ অবধি পুলিশও এল। বোধহয় ডাক্তার বা গাঁয়ের মোড়লরা খবর দিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে মুরুব্বি মাতব্বররাও এলেন।

প্রথমেই ঝামেলার প্রশ্ন। এখানে আপনি তাঁবু খাটিয়ে আসলে কী করছেন? যার জমি তার পারমিশন নিয়েছেন কি না? আপনি জানেন কিনা যে, গুপ্তধন বা পুরাদ্রব্য সরকারী সম্পত্তি? ইত্যাদি।

মনীশ ঘামছিল। বুঝতে পারছিল, তার সব তো গেছেই, এবার হয়তো সামাজিক মর্যাদাও যাবে। সে যা সব জবাব দিল, তা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং মিথ্যেও। দীনেশবাবুর নির্দেশে এবং তারই অনুমতিক্রমে সে এখানে একটা পুকুর কাটার চেষ্টা করছে, এইসব এলেবেলে কথা। পুলিশ বিশ্বাস করল না।

পুলিশ এরপর চুরির একটা বিবৃতি নিল। তারপর বল, কাজ বন্ধ রাখুন। আরও এনকোয়ারি হবে। দরকার হলে আমরা আপনাকে অ্যারেস্টও করতে পারি।

জ্ঞানবয়সে মনীশ কখনো কাঁদেনি। কিন্তু পুলিশ চলে যাওয়ার পর আজ তার কাঁদতে ইচ্ছে

করছিল।

কোনও ওষুধপত্র নেই, চিকিৎসা নেই, এমন কি পথ্যও নেই. মনীশ শুধু চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল ক্যাম্প খাটে। চোখ বোজা। গা-ভরা জ্বর। ব্যথা তীব্র। মন হতাশায় ভরা। চোরটাকে সে টর্চের আলোয় দেখেছে। মুখটা সে জীবনে ভুলবে না। লোকটাকে যদি খুঁজেও পায় কী করবে মনীশ? আবার জাপটে ধরবে? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে? কিন্তু কিছু কি প্রমাণ করতে পারবে তাতে?

হার মেনে নেওয়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই।

দুপুরবেলা, কাজ নেই বলে লেবাররা কে কোথায় বেরিয়ে গেছে। মনীশ টের পেল কয়েকজন গুপ্তধন শিকারী আজকেও এসেছে। আশেপাশে কোদাল শাবলের আওয়াজ। এদের গুরুত্ব দেওয়ার কিছুই নেই। এরা জানে না কী খুঁজছে। হয়তো পেতলের কলসীভরা মোহর ছাড়া কল্পনার দৌড় বেশী দূর নয়।

কিন্তু আজ মনীশের হঠাৎ বড় রাগ হল। শরীরটা চিড়বিড় করে উঠল রাগে। মাথাটা গরম লাগল খুব। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই টলতে টলতে বেরিয়ে এল। এই নড়াচড়ায় তার মাথার ব্যাণ্ডেজ নতুন করে রক্তে ভিজে যাচ্ছিল।

বেরিয়ে এসে সে দেখতে পেল, নিতান্তই গরীবগুরবো চেহারার রোগাভোগা তিন-চারটে লোক। একজনের সঙ্গে আবার একটা বউও আছে।

মনীশ হুংকার দিয়ে উঠল, এই শালারা, ফোট...!

লোকগুলো যেন ভূত দেখে চমকে উঠল। এরকম দৃশ্য তারা দেখেনি। রক্তাক্ত একজন মানুষ খুনীর মতো এসে দাঁড়িয়েছে। একটু থমকে গিয়েছিল তারা। তারপর দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল। এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com সাইট থেকে ডাউনলোডকৃত।

ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মনীশ ফের তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ল, ব্যাণ্ডেজটা পাল্টানো দরকার। দরকার ওষুধেরও। কিছু খাওয়ার দরকার। তার বড্ড জ্বর। জ্বর বাড়বে।

কিন্তু কিছুই করল না মনীশ। চুপচাপ শুয়ে রইল।

বিকেলের দিকে লেবারদের একজন ফিরে এল। মন্টু। তার বয়স সবচেয়ে কম। তাঁবুতে ঢুকে বলল, স্যার, আপনি কি কিছু খেয়েছেন?

এই ছেলেটাই শুধু কে জানে কেন মনীশকে স্যার বলে ডাকে। মনীশ বেহুঁশ জ্বরের চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, না, তোমাদের তা নিয়ে ভাবতে হবে না।

ছেলেটা তাঁবুর এক কোণে বসে রইল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। মনীশ আবার ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নতায় চলে গেল। যখন জাগল তখন তাঁবুর মধ্যে তার হারিকেনটা জ্বলছে। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির আওয়াজ। প্রচণ্ড শীত।

মন্টু তাঁবুর দরজাটা পর্দা ফেলে বেঁধে দিচ্ছিল। বলল, এখানে থাকলে স্যার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

মনীশ জ্বরের যন্ত্রণায় একটা কাতর শব্দ করল। শরীর ভীষণ দুর্বল। শীতটা সে সহ্য করতে পারছে না, শুধু বলল, হুঁ।

মন্টু খুব গল্পবাজ ছেলে নয়। কম কথা বলে। ছেলেটা ভাল না মন্দ তা মনীশ জানে না, তবে ফিরে এসেছে বলে ভাল লাগল।

অন্য লেবাররা কোথায় মন্টু?

তারা আর আসবে না, পেমেন্ট পাবে না জানে তো।

তুমি এলে কেন?

মন্টু কথাটার জবাব দিল না। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ বলল, আমাদের বাড়িতেও চুরি হয়ে গেছে।

মনীশের তাতে কিছু যায় আসে না। বলল, ও।

দু'হাজার টাকা আমার বাবা কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিল আমার মায়ের চিকিৎসার জন্য। দাদা টাকাটা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

তৈরি ছেলে তো।

বাড়িতে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। অত টাকা আমরা জন্মেও একসঙ্গে চোখে দেখিনি। বাবা ধারকর্জ করে পাঠিয়েছিল।

মনীশ উঠে বসল। চোরের হাতে মার খাওয়ার পর থেকে সে এযাবৎ একটিও সিগারেট খায়নি। এখনও বিস্বাদ মুখে সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে না। তবু বলল, মন্টু, আমার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা কোথায় আছে দেখবে একটু? বালিশের পাশেই থাকে। সেদিন চোরের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ছিটকে পড়েছে।

মন্টু খাটের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই কুড়িয়ে দিয়ে বলল, চাল ডাল আছে স্যার, বলেন তো খিচুড়ি করে দিতে পারি।

খিচুড়ি খাওয়া কি ঠিক হবে? আমার যে জ্বর।

আমরা তো জ্বর হলে খিচুড়িই খাই। এমনিতে ভাত, কিন্তু জ্বর হলেই খিচুড়ি।

আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। স্টোভটা দেখ তেল আছে কি না। পারলে আমাকে একটু চা করে দাও।

আপনি কিন্তু দু'দিন কিছুই খাননি।

আর খাওয়া! বলে মনীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সিগারেট ধরিয়ে সে কোনও স্বাদ পাচ্ছিল না। মাটিতে পড়ে থাকায় প্যাকেটটায় একটু ড্যাম্পও লেগে থাকবে। কয়েকবার কেশে সে সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, তুমি কি রাতে এখানে থাকবে?

থাকতে পারি। আপনি জ্বরের ঘোরে পড়ে আছেন।

আমার লোকের দরকার নেই। তবে তুমি ইচ্ছে হলে থাকতে পারো।

মন্টু স্টোভ ধরাল। চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে একটু লাজুক গলায় বলল, আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন স্যার? বাড়তি ঘর আছে।

তোমাদের বাড়িতে? না, তার দরকার নেই। আমি কলকাতায় ফিরে যাবো।

এই জ্বর নিয়ে?

না, জ্বর কমলে।

এখানে থাকলে জ্বর কমবে না। এ হল তেপান্তরের মাঠ, বৃষ্টি হচ্ছে, টেনে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। এখানে থাকলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

চোরটাকে তুমি দেখেছো মন্টু?

মন্টু মাথা নেড়ে বলল, না। আমার ঘুম খুব সাংঘাতিক। একবার ঘুমোলে আর গায়ে ছ্যাঁকা দিলেও ঘুম ভাঙে না।

অন্যরা কেউ দেখেনি?

না বোধহয়। দেখলেও বলবে না। এ তো চুরি-ডাকাতিরই জায়গা। সবাই চোর। আমাদের গাঁয়ে ডাকাতদের দল আছে।

মনীশ চা খেয়ে একটু ভাল বোধ করল।

এবার খিচুড়ি চাপিয়ে দিই স্যার? একটু চোখে দেখবেন কেমন হয়।

মনীশ একটু হাসল, বলল, চাপাও।

মন্টু চালডাল ধুয়ে খিচুড়ি চাপিয়ে বলল, কাল সকালে চলুন আমাদের বাড়ি। জ্বর কমলে কলকাতায় যাবেন।

মনীশ কম্বলটা ফের বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলল, কাল বরং সাইকেলটা হবিবপুরের সাইকেলের দোকানে পৌঁছে দিও। তিন দিনের ভাড়া বাকী পড়েছে, সেটাও নিয়ে যেও। তাঁবুটাও রফিক মিয়ার ডেকোরেটার থেকে ভাড়া করে এনেছিলাম। ফেরত দিতে হবে। তবে কয়েকদিন পর। পারবে?

পারব। তবে কয়েকদিন পর কেন? কালই দুটোই ফেরত দিয়ে দিই। আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন।

মনীশের মোট ছয়জন লেবার ছিল। সবাই স্থানীয় লোক। সাধারণ এক্সকাভেশানে এর চেয়ে বেশী লোক লাগে না। দিনে বারো টাকা মজুরী। চারজন হলেও হত। কিন্তু মনীশ চেয়েছিল ঝট

করে কাজটা সেরে ফেলতে। লেবারদের মধ্যে মন্টুটাই যা একটু ভদ্রলোক। হয়তো পুরাতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ আছে। যখন মাটির তলা থেকে জিনিস বের হতে শুরু হল তখন সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকত, জিনিসগুলো যখন ধোয়ামাজার পর সাজিয়ে রাখছিল মনীশ তখন সে কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। সেই চোখ লোভীর ব্যবসায়িক চোখ নয়, আগ্রহীর চোখ।

চায়ের পর মনীশ একটা সিগারেট ধরিয়েছে। খারাপ লাগছে না। মন্টুর খিচুড়ির একটা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

মনীশ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি লেখাপড়া জানো?

ক্লাস এইট।

আর পড়নি কেন?

পড়ে কী হবে?

বাস্তবিকই পড়ে কী হবে? মনীশের নিজের কী হয়েছে! অপমানিত, লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত এক প্রত্নচোর। সে একটু ম্লান হাসল। কিছু বলল না।

মন্টু যখন খিচুড়ি খেতে ডাকল তখন আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে বসল মনীশ। বিছানার ওপর বসেই গরম খিচুড়ি খেল। খিদের মুখে খুব খারাপ লাগল না। মনটা আগের মতো আর খারাপ লাগছে না। এই যে একটা ছেলে তার কথা ভাবছে, তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই, শুধু এটুকুই মনীশকে অনেকটা মেখে ফেলেছে আজ। মানুষের কাঙাল মন মাঝে মাঝে কত অল্পেই খুশি হয়ে যায়।

খাওয়ার পর যখন সিগারেট ধরিয়েছে মনীশ তখন মন্টু সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে এমন গলায় বলল, তাহলে কাল সকালে কিন্তু আপনি আমার সঙ্গেই যাবেন। মা বলেছে বাবুর তো খুব কষ্ট যাচ্ছে, আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসিস।

মনীশ বলল, দেখা যাক।

ক্লান্ত আহত শরীর আর জ্বরভারে মনীশ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। যখন ঘুম ভাঙল তখন মন্টু তার সামান্য জিনিসপত্র সবই গুছিয়ে ফেলেছে। একটা রিক্সা-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর বাইরে। মনীশ ওঠার পর চটপট ছোট্ট তাঁবুটা গুটিয়ে ফেলল মন্টু।

মনীশ আপত্তি করতে পারল না। তার এখন সত্যিই একটা আশ্রয় চাই।

মন্টুদের বাড়িটা নিতান্তই গরীব বাড়ি। খুব কষ্টেই সংসার চলে এদের। তবু তাকে ডেকে এনেছে এটা এক মস্ত উদারতা। মাটির ঘরে একটা চৌকিতে শুয়ে পথশ্রমে ক্লান্ত মনীশ ভারী আরামের একটা শ্বাস ছাড়ল। ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই বটে, কিন্তু একটা সস্তা টেবিল আর চেয়ার রয়েছে। দেওয়ালে একটু উঁচুতে দড়িতে ঝোলানো একটা কাঠের তক্তায় বেশ কিছু বই। একটা মোটা ডিকশনারি পর্যন্ত। যত্নে মলাট দেওয়া।

রুগ্‌ণ পাঁশুটে চেহারার মন্টুর মা এসে বলল, আপনার খুব কষ্ট গেছে শুনলাম। এ জায়গা ভাল নয়। চোর ছ্যাঁচোর ডাকাত কত যে অশান্তি।

মনীশ মৃদু হেসে বলল, তাই দেখছি।

আপনি দীনেশবাবুর আত্মীয় না?

হ্যাঁ, তবে তিনি আমাকে পছন্দ করেন না।

কেন?

গরীব আত্মীয়কে কে পছন্দ করে বলুন!

মন্টুর মা শহুরে ভদ্রতা জানে না। নমস্কার-টমস্কার কিছু করেনি, সামনে বসে বলল, মন্টু আপনার কথা খুব বলে। আপনি যদি কাজ বন্ধ করে দেন তবে ছেলেটা আবার বেকার হয়ে যাবে।

কাজ তো আর করার উপায় নেই। আমার সব চলে গেছে।

শুনেছি। তবু আপনারা বাবু লোক, আবার দাঁড়াতে পারবেন। আমাদেরই কোনও গতি হয় না। আমার একটা খারাপ অসুখ হয়েছে, বাঁচব না। ছেলেমেয়েগুলোকে কে দেখে বলুন। এখনও তো মানুষ হয়নি।

মনীশ একথার আর কী জবাব দেবে?

মন্টুর মা আরও কিছুক্ষণ দুঃখের কথা বলল। মহিলা চলে যাবার পর হাঁফ ছাড়ল মনীশ। দীনেশবাবুর আত্মীয় বলেই সে এবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে তাহলে? ব্যাপারটা তার ভাল লাগল না। দীনেশকাকা শুনলে খুশি হবে না।

চোখ চেয়ে মনীশ ঘুলঘুলির মতো জানালা দিয়ে পেয়ারার ডাল, শালিখের নাচানাচি দেখছিল। জ্বর আজ কম মনে হচ্ছে। রাতের খিচুড়ি তার কিছু উপকার করে থাকবে।

একটি কিশোরী মেয়ে বাটিতে মুড়ি আর গেলাসে চা নিয়ে এল। তার দিকে চেয়ে বলল, আপনার খুব হেমারেজ হয়েছে। মাথার ব্যান্ডেজটা পাল্টাননি কেন?

মেয়েটিকে দেখে মনীশ একটু অবাক হল। দেখতে ভাল বলে নয়। মেয়েটির মুখেচোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। হেমারেজ শব্দটা বেশ উচ্চারণ করল তো!

বিস্ময়টা গলাতেও ফুটল মনীশের, তুমি কি মন্টুর বোন?

হ্যাঁ। আমার নাম মনু। মন্টুকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। আপনি ততক্ষণ এটা খেয়ে নিন।

মনীশ উঠল। হাত বাড়িয়ে চা আর মুড়ির বাটি নিল।

মনু বলল, ঘরে চোর এলে তাকে ধরতে নেই। তাতেই বিপদ হয়। আপনি কেন যে চোরকে ধরতে গেলেন।

মনীশ মৃদু হেসে বলল, চোর এলে না ধরাই বুঝি নিয়ম?

চোরের কাছে আজকাল অস্ত্র থাকে। সবাই একথা জানে। তাছাড়া চোর হল সজাগ, আর গেরস্তরা ঘুম ভেঙে উঠে বলে ততটা সজাগ থাকে না।

ঠিকই বলেছো। তবে চোরটাকে না ধরে আমার উপায় ছিল না। আমার সবই তো সে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনু একটু যেন অবাক হয়ে বলল, আপনার কি অনেক টাকা চুরি হয়েছে?

আমার কাছে অনেক টাকা।

কত হবে?

নগদ ধরো চার পাঁচ হাজার টাকা।

মনু একটু হেসে বলল, বেঁচে থাকলে ওরকম কত টাকাই তো রোজগার করে মানুষ। ও টাকার জন্য বুঝি কেউ ছোরার মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে? শাসনবাবুর কাছে শুনেছি আপনি এম. এ. পাস! ইচ্ছে করলেই তো আপনি অনেক রোজগার করতে পারেন।

রোজগারের রাস্তা অত সহজ হলে ভাবনাই ছিল না। ভাল কথা, শাসনবাবুকে তুমি চেনো?

চিনব না কেন? এক গাঁয়েই তো থাকি।

তাঁর সঙ্গে আমার একটু দেখা করা দরকার।

মনু হঠাৎ একটু রহস্যময় হাসি হাসল। তারপর বলল, তিনিই আসবেন, চিন্তা করবেন না। আপনি কিন্তু মুড়ি খাচ্ছেন না। ছোলাভাজা আদাকুঁচি দিয়ে মেখে দিয়েছি। খেলে খারাপ লাগবে না।

শক্ত কিছু চিবোতে গেলেই মাথায় টনটন করে।

কষ্টের কথা শুনেই মনুর চোখ ছলছল করে উঠল, ইস! তাহলে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিই?

না, না, জলে ভেজা ন্যাতানো মুড়ি খেতেই পারব না, তার চেয়ে এটাই খাচ্ছি।

মনু করুণ মুখ করে বলল, তাহলে অন্য কিছু দেব? পাঁচুর দোকানে বোধহয় পাঁউরুটি আছে।

না, তার দরকার নেই। বলে মনীশ একটু মুড়ি চিবলো। চা-টুকু খেল।

মনু তার কষ্টের খাওয়া দেখে মৃদুস্বরে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে, মুড়ি চিবোতে আপনার কষ্ট হবে।

মনীশ সদয় গলায় বলল, গত দু'দিন কিছুই খাইনি। মন্টু ভাল খিচুড়ি রাঁধে, কাল খিচুড়ি রেঁধে না খাওয়ালে—

জানি। মন্টু বলেছে। আপনি নাকি চোরের ওপর রাগ করে উপোস করছেন।

মনীশ একটু হাসল, মাথা নেড়ে বলল, তা নয়। রাগ ছিল ঠিকই, কিন্তু উঠে কিছু যে রান্না

করে নেবো সেই সাধ্যও ছিল না। ওকথা থাকগে। এসব বইপত্র কার বলো তো! কে পড়ে? তুমি?

মনু লাজুক হেসে বলল, পড়তাম।

কী পড়তে?

মাধ্যমিক পাশ করে আর পড়িনি।

পাশ করেছো? বাঃ। আর পড়লে না কেন?

কে পড়াবে বলুন? শচীনবাবুর জন্যই পাশ করেছিলুম। শচীনবাবুও চলে গেলেন আর আমার পড়াও বন্ধ হয়ে গেল।

শচীনবাবু কে?

মনু নতমুখ হয়ে মৃদুস্বরে বলল, মাস্টারমশাই ছিলেন। এখন প্রফেসর হয়ে রঘুনাথপুর চলে গেছেন।

কে জানে কেন, ভঙ্গিটার মধ্যে মনীশ ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্কের অতিরিক্ত কিছুর আভাস পেল। এবং সেটা কেন যেন তার মনঃপূত হল না। মনীশ গম্ভীর হয়ে বলল, মাস্টার মশাই চলে গেল বলে তোমার পড়া হল না এটা কেমন কথা? একজন মাস্টার মশাইয়ের অভাবে কারও পড়া বন্ধ হয় নাকি?

আমার আর পড়তে ইচ্ছে করল না, ওঁর জন্যই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিলাম। অঙ্কে আর লাইফ সায়েন্সে লেটার ছিল।

মনীশ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। ফার্স্ট ডিভিশন! দু'দুটো লেটার? পর মুহূর্তে সামলে গিয়ে বলল, এটা তোমার ভীষণ ভুল। এত ভাল রেজাল্ট কোনও মাস্টার মশাইয়ের জন্য হয় না, ছাত্রীরও মাথা লাগে।

আমার মাথা-টাথা নেই। শচীনবাবুর জন্যই ওটা হয়েছিল।

মনীশ একটু রেগেই গেল, ভারী বোকা তো মেয়েটা! কে কোথাকার শচীনবাবু এর মাথাটাই বিগড়ে দিয়ে গেছে। সে সামান্য তপ্ত গলায় বলল, শচীনবাবুর জন্য! শচীনবাবুর জন্য! পোষা পাখির মতো কথাটা বলে গেলেই তো হবে না। শচীনবাবু কি শাড়ি পরে তোমার হয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলেন?

মনু একথায় ফিক করে হেসে ফেলল, যাঃ। পরীক্ষা দেবেন কেন?

উনি তোমাকে সাহায্য করেছেন মাত্র। মাস্টারমশাইদের কাজই তো তাই। তুমি কেন হিপনোটাইজড্ হয়ে আছো?

মনু নতমুখ হয়ে বলল, শাসনবাবুও তাই বলেন। কিন্তু আমি কী করব বলুন তো! আমার যে মনে হয় শচীনবাবু ছাড়া পারব না।

খুব পারবে, শচীনবাবু কোনো ফ্যাকটরই নয়।

আমার অবশ্য লেখাপড়া না করার আর একটা কারণও আছে। মায়ের অসুখ।

উনিও বলছিলেন বটে, ওঁর খারাপ অসুখ, বাঁচবেন না, তোমার মায়ের কী হয়েছে?

ডাক্তার তো বলছে ক্যানসার।

গাঁয়ের ডাক্তারের কথা বিশ্বাস কী? ব্যায়োপসি হয়েছে?

না কিছুই হয়নি। ডাক্তার শুধু বলেছে, সন্দেহ হচ্ছে ক্যানসার। পেটে একটা বড় টিউমার ধরা পড়েছে।

টিউমার হলেই ক্যানসার হয় না। ওসব বিশ্বাস কোরো না।

খারাপটাই যে ফলে যায়।

তুমি একদম গাঁইয়া। খারাপটাই ফলে এরকম কোনও নিয়ম নেই।

মনু আবার ফিক করে হাসল। আজকের সকালটা ওই হাসির ফ্রেমেই বাঁধা রইল মনীশের। দিন তিনেক অতল গহীন এক গহ্বরে বাস করার পর কে যেন তাকে টেনে তুলছে আলোয়, হাওয়ায়।

বেলা দশটা নাগাদ শাসন এল। ধীর স্থির বিচক্ষণ মূর্তি।

শাসনবাবু, সব শুনেছেন বোধহয়!

সব শুনিয়াছি মহাশয়। বড়ই দুঃখের কথা। পুলিশে খবর দিয়াছেন কি?

পুলিশ নিজেই এসেছিল। তবে তারা কিছু করবে না। কিন্তু আমি লোকটাকে দেখেছি। যেখান থেকেই হোক তাকে খুঁজে বের করবই।

বাহির করিয়া কী করিবেন। আইন স্বহস্তে লইবেন কি? তাহা হইলে বড়ই অরাজকতা হইবে।

দেশে অরাজকতা ছাড়া আর কী আছে? পুলিশের সাধ্যও নেই এসব গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে শাসন বজায় রাখে। আমি বিস্তর খুন আর রেপ দেখেছি।

শাসন মৃদুস্বরে বলল, আমিও দেখিয়াছি। এখন দুঃশাসনদের রাজত্ব।

চুরিটার পর আমার মাথায় খুন চড়ে গেছে। আমার মায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছিলাম। আমি ছাড়ব ভেবেছেন?

শাসন একটা শ্বাস ফেলে বলল, চোর যদি ধরিতেও পারেন তাহাতে লাভ কী? সে এতদিনে মাল বেচিয়া দিয়াছে, টাকাও ঘরে বসাইয়া রাখে নাই। সে চুরির কথা কবুলও করিবে না। উপরন্তু চোর স্থানীয় লোক, জোট বাঁধিয়া আপনার ক্ষতিসাধন করিতে পারে। ইহা প্রকৃতই দুঃশাসনের রাজত্ব।

মনীশ ফুঁসে উঠে বলল, কবুল তাকে করতেই হবে। আমি করাবো। আপনি দেখবেন। আমার দুঃশাসনের ভয় নেই।

শাসন মৃদু একটু হেসে বলল, মহাশয়, উত্তেজিত মস্তিষ্কে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা বাস্তবে সম্ভব হইবে না। যখন মস্তিষ্ক শীতল হইবে তখনই বুঝিবেন বন্যা মহিষ বিতাড়ন করিয়া লাভ নাই। বরং আমি যে শিবলিঙ্গটির কথা বলিয়াছিলাম আপাতত তাহা লইয়া গিয়া কিছু ক্ষতিপূরণ করুন। তাহার পর দেখা যাইবে।

আপনি শিবলিঙ্গের জন্য তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি টাকা কোথায় পাবো?

শাসন মাথা নেড়ে বলল, নগদ দিতে হইবে না। যদি বেচিতে পারেন তাহা হইলে আমাকের মূল্যের এক দশমাংশ দিবেন।

আজকের সকালটা মনীশের কাছে যেন অবিশ্বাস্য লাগছে। কোনও যাদুমন্ত্রবলে কলিকাল কেটে গেল নাকি? সে তবু নিজেকে কৃতজ্ঞতায় ভেসে যেতে দিল না। বলল, টেন পারসেন্ট কিন্তু তিন হাজার হবে না।

আমি অঙ্কে অপারদর্শী নহি। আমাকে তিন হাজার দিতে হইলে আপনাকে উহা ত্রিশ হাজারে বিক্রয় করিতে হয়।

ঠিক তাই। অত দাম কেউ দেবে না।

জানি মহাশয়। আপনি যাহা পাইবেন তাহারই এক দশমাংশ দিবেন। এখন আমি চলিলাম। আপনার চিকিৎসক আসিতেছেন।

শাসন চলে যাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে মন্টু একজন ডাক্তার নিয়ে এল। মন্টুর হাতে ওষুধ, ইঞ্জেকশন। ডাক্তারটিও নতুন।

মনীশ ভাবল, এরা এত গরীব, তবু কত খরচ করছে আমার জন্য। বোধহয় ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়েছে। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মনু মাধবীলতায় ছাওয়া ফটকটার কাছে আপনমনে দাঁড়িয়ে ছিল। আজ অনেকদিন পর সে একটু হেসেছে, একটু ভাল লাগছে মনটা।

ঝন্টু টাকা চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে কেউ হাসেনি।

মনু কখনোই ভুলতে পারে না যে, তারা গরীব আর তার বাবা কলকাতায় গত দশ বছর ধরে একটা বাড়ির চাকরের কাজ করছে। আর ভুলতে পারে না বলেই কি তার কখনও উচ্চাকাংক্ষা হয় না? তাদের মতো বাড়ির লোকেরা কি আর ভাল কিছু হতে পারে? এই তো তার দাদা ঝন্টু চোর ছ্যাঁচড় বদমাশদের সঙ্গে মিশে বখে গেছে। মন্টুও প্রায় তাই। তবে ঝন্টুর মতো ততটা খারাপ নয়, এই যা। মনুরই বা ভাল হওয়ার কথা কিসে? একমাত্র শচীনবাবুই তার জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। শচীনবাবুর মুখ চেয়েই সে প্রাণপণে পড়া মুখস্থ করত, মাথা খাটাত। শুধু শচীনবাবুকে খুশি করার জন্য। মনীশবাবু কখনোই বুঝতে পারবে না শচীনবাবু

তার কতখানি ছিল।

ছিল! এখনও কি নেই?

ভেবে দেখলে, শচীনবাবু এখনও আছেন। মনু প্রায়ই শচীনবাবুর কথা বিভোর হয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে চোখে জল আসে।

আজও সে শচীনবাবুর কথাই ভাবছিল। মনীশবাবু তাকে পড়াশুনো করতে বলছেন। সে কি পারবে? একবার মনে হচ্ছে পারবে। আবার মনে হচ্ছে, না পারবে না।

মনীশবাবুর ঘর থেকে শাসন বেরিয়ে এল। মনুর কাছে এসে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে বলল, মনু, এইটা রাখিয়া দাও।

টাকা! কী হবে?

লাগিবে। দীনেশবাবুর আত্মীয়, মান্য অতিথি। তাহার পরিচর্যায় ত্রুটি রাখিও না।

মায়ের কাছে উনি কী বলেছেন জানেন? বলেছেন দীনেশবাবু নাকি ওঁকে পছন্দ করেন না।

হইতে পারে। এমনিতে হয়তো পছন্দ করেন না, কিন্তু অনাদর হইয়াছে জানিলে হয়তো সেটাও পছন্দ করিবেন না। বাবুদের মনস্তত্ত্ব আমরা কী বুঝিব? আগু হইলেও দোষ, পাছু হইলেও দোষ।

মনু তার স্বভাবসিদ্ধ ফিক-হাসিটি হাসল। টাকাটা নিয়ে বলল, মান্য অতিথির জন্য কী কী করতে হবে বলে যান।

পরিহাস করিতেছ? বেশী কিছু করিতে হইবে না। এমন কিছু করিও না যাহা বিসদৃশ। আর আমি যে টাকা দিতেছি ইহা ঘুনাক্ষরেও যেন জানিতে না পারেন।

কতবার বলবেন শুনি!

বাবুটি বড়ই অভিমানী। উপরন্তু বড়ই রাগিয়া আছেন।

চোরদের তো সবাইকেই আপনি চেনেন। কে ওঁকে এরকম মারল বলুন তো!

শাসন হাতের একটা অসহায় ভঙ্গী করে বলল, কে বলিবে? চোর ডাকাইতেরা বিপদে পড়িলে আমার পরামর্শ লইতে আসে বটে, কিন্তু পাষণ্ড সকল তাহাদের চুরি বা লুণ্ঠনের স্বীকারোক্তি করিতে আসে না। তাহারা ততদূর ভাল মানুষ নহে।

বড্ড মেরেছে। ওঁরও দোষ ছিল। কেন যে ধরতে গেলেন চোরকে।

বাবুটি দুঃসাহসী। মন্টুকে সাবধান করিয়া দিয়াছি, কিছু দেখিয়া থাকিলেও যেন বাবুটির কাছে না বলে। চোরকে চিনিতে পারিলে উনি হয়তো হত্যাই করিয়া বসিবেন।

মন্টু কি আপনাকে বলেছে যে ও চোরকে দেখেছে?

শাসন উদাস হয়ে গিয়ে বলল, না।

তবে আপনার সন্দেহ হচ্ছে কেন যে, মন্টু দেখে থাকতে পারে?

শাসন একটু হাসল, তুমি বড়ই বুদ্ধিমতী। আমার খুব ইচ্ছা একদিন রঘুনাথপুরে গিয়া শচীনবাবুকে ধরিয়া আনি।

ওমা? কেন?

তোমার মতো বুদ্ধিমতী পঠনপাঠন করিলে কত না উন্নতি করিবে। কিন্তু মুশকিল হইল শচীনবাবুকে ছাড়া তুমি তাহা করিবেও না। শচীনবাবুকে ধরিয়া আনিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিব, মহাশয়, আপনি এই কন্যাটির ভবিষ্যৎ কিভাবে নষ্ট করিয়াছেন স্বচক্ষে দেখুন।

মনু লাল হল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, যাঃ। আমার যা হয়েছে তাই ঢের। আর হয়ে কাজ নেই বাবা। সেই তো কোন গেঁয়ো ভূতের হেঁসেলে ঢুকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে। পাশ করে হবে কোন কুচপোড়া?

শাসন মাথা নেড়ে বলল, আত্মাবমাননা এক প্রকার রোগ। তোমার হীনমন্যতার কোনও কারণ নাই। তোমার প্রপিতামহ দীনেশবাবুদের ম্যানেজার ছিলেন।

সে তো পুরোনো কাসুন্দি।

তোমাদের বংশটি খারাপ নহে। কর্মের দোষে কিছু ঘাটতি হইয়াছে।

ওসব কথা আমরা আর এখন ভাবি না শাসনবাবু। ভাবতে হাসি পায়। আমরা এখন যা ঠিক তা-ই। আমার বাবা এক বাড়ির চাকর। তার মেয়ে হয়ে আমার বেশী বাড় হওয়া কি ভাল?

মনু, তোমাকে এক অনিচ্ছার ভূতে পাইয়াছে। কিন্তু ভূতের ওঝাটি তো হাতের কাছে নাই। ওঝা এখন রঘুনাথপুরে অধ্যাপনা করিতেছেন।

না, আমার ভূত নামানোর জন্য কোনও ওঝার দরকার নেই। যে যার মতো সুখে থাকলেই হল। মনুর জন্য কাউকে ভাবতে হবে না শাসনবাবু।

কেহ না কেহ হয়তো ভাবিবে। সে কথা যাক। যাহা হাতের কাছে নাই তাহা লইয়া ভাবিয়া কালক্ষেপ অর্থহীন। আশু সমস্যা হইল দীনেশবাবুর আত্মীয়টি। তাহাকে তুষ্ট রাখিতে হইবে।

ওটা নিয়ে ভাববেন না।

শাসন চলে যাওয়ার পরই মন্টু ডাক্তার নিয়ে এল। গরম জলের হুকুম হল। মনু ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার স্টিচ করার যন্ত্রপাতি এনেছেন। মনু সভয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল ডাক্তার ব্যান্ডেজ খুলে জমাট রক্ত ধুয়ে মাথার তিন জায়গায় হাঁ হয়ে থাকা ক্ষতস্থানের চারদিককার চুল কামিয়ে নিয়ে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দিয়ে সেলাই করছেন। মনীশ একটু বিকৃত মুখে, কিন্তু একটিও কাতরতার শব্দ না করে ওই আসুরিক ব্যবস্থা সহ্য করছে। সেলাই হল হাতেও। কী সাংঘাতিক রক্তপাত হয়েছে লোকটার তিন দিন ধরে, তা ব্যান্ডেজের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর ডাক্তার মনীশকে একটা ইনজেকশন দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

মনু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তারটির বয়স অল্প। কিন্তু চালাক চতুর চেহারা। বলল, সেপটিক এখনও হয়নি। যদি ইনফেকশন কিছু হয়ে থাকে তবে আমার কিছু করার নেই। নইলে এমনিতে ভাল। খুব স্ট্রং কনস্টিটিউশন।

মনু একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। সকালে লোকটার যা অবস্থা দেখেছিল তাতে ভয় হয়।

মন্টু ডাক্তারকে এগিয়ে দিতে গেল। মনু ঘরে ঢুকে ব্যান্ডেজের ন্যাকড়া তুলো সব ফেলে এল বাইরে। ঘরটা পরিষ্কার করল।

মনীশ ক্লান্তিতে চোখ বুজে ছিল। দ্বিতীয়বার মনু ঘরে ঢুকতেই বলল, তোমাকে পড়তে হবে।

মনু হেসে ফেলে বলল, হঠাৎ ওকথা কেন?

আমি কেবল ভাবছি এটা কি করে সম্ভব যে তোমাকে একজন হিপনোটাইজ করে রেখেছে। তুমি কি লোকটার প্রেমে পড়েছো? সে কেমন লোক? কত বয়স?

মনু হকচকিত হয়ে দেখল, মনীশের চোখমুখ কেমন ক্ষ্যাপাটে। মনু মাথা নেড়ে বলল, না। ওসব নয়।

তাহলে?

।। আট ।।

এবাড়িতে তেমন কোনও কান্নাকাটিই নেই। শ্মশান থেকে ফিরেই বাপ-ব্যাটায় দুই বাথরুমে ঢুকে গরম জলে স্নান করল। তারপর ড্রেসিং গাউন পরে এসে রোজকার মতো ডাইনিং টেবিলে বসল। একটু গম্ভীর মুখ এই যা। যদু চা নিয়ে এল। দুজনে খুবই আগ্রহ আর পিপাসার সঙ্গে চা খেল। দু'কাপ তিন কাপ করে। সুমিত ধরা পড়েনি, মাথাও বোধহয় কামাবে না। ওসব এরা বড় একটা মানে-টানে না। তবে শ্রাদ্ধ হবে। পেল্লায় করেই হবে। আমেরিকার ছেলে দুই একদিনের মধ্যে এসে পড়বে, কাল রাতে ট্রাংক কল চলে গেছে। মেয়েও আসছে।

সাতটায় খবরের কাগজ এল। মৃগাঙ্কবাবু কাগজ নিয়ে বারান্দার কৌচে গিয়ে বসলেন, রোজকার মতোই। একবার শুধু যদুকে ডেকে বললেন, বাজারে গেলে মাছ-টাছ আনিস না। কয়েকদিন ওসব বাদ থাক।

হবিষ্যি হবে নাকি?

মৃগাঙ্ক একটু আতঙ্কিত গলায় বললেন, না না, ওসব নয়। তবে মাছ-মাংসটা বাদ থাক। বলেই উচ্চকণ্ঠে ছেলেকে ডেকে বললেন, কি রে বলু, ক'দিন নিরামিষ হলে অসুবিধে আছে?

সুমিত টেলিফোন ডিরেকটরিতে কার একটা নম্বর খুঁজছিল। বলল, হিন্দু রিচুয়ালস্? ইটস্ অলরাইট উইথ মি। নো প্রবলেম।

মৃগাঙ্ক আবার একটু ভেবে বললেন, ফ্রিজে মাছ-টাছ থাকলে তোরাই খেয়ে নিস।

গিন্নীমার চিতা এখনও ভাল করে ঠাণ্ডা হয়নি। তবু এর মধ্যে এরা কত স্বাভাবিক। যেন কিছুই তেমন হয়নি। রোজকার মতোই এও আর একটা দিন। যদু পারত না। গরিবেরা পারেও না এরকম হতে। কিন্তু তাদেরটাই ভাল না এদেরটাই তা বুঝতে পারছে না যদু। মাটিতে গড়িয়ে, হাত পা ছুঁড়ে, বিলাপ করে যে শোকটা প্রকাশ হয় তার অনেকটাই নকল বটে, কিন্তু একেবারে ফাঁকা নয়। আর এখানে তো মোটে শব্দই হল না। হাসিটাসিগুলো বাবুরা রুমালে মুছে পকেটে রেখেছেন বটে, কিন্তু কান্নার মেঘটুকু পর্যন্ত দেখা গেল না যে। কাল রাতের দৃশ্যটাও খামচা মেরে আছে বুকের মধ্যে যদুর। একেবারে বাঘের থাবার মতো। শেষ অবধি অলকার সঙ্গে মৃগাঙ্কবাবু জুটলেন। দুনিয়ায় কত কীই যে হয়। কিছু আর বাকী রইল না। যদুর বুক জ্বালা করে। কলজেটা কে যেন ওভেনে ঢুকিয়ে দিয়ে থার্মোস্টাটটা চূড়ান্ত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাজারে বেরোবার মুখে সিঁড়ির তলায় একবার উঁকি মারল যদু। ঝন্টু এখনও ঘুমোচ্ছে। মাথার নিচে বালিশের বদলে দুটো কিসের যেন প্যাকেট, বুকের নিচে একটা পাপোষ। ব্যাটা ফূর্তি করতেই কলকাতায় এসেছিল কি? যদু একটু ঝুঁকে ঝন্টুর মুখটা শুঁকে দেখল। না, মদের গন্ধ নেই। বুকপকেট থেকে একগোছা ভাঁজ করা নোট বেরিয়ে আছে। যদু সন্তর্পণে তুলে গুণে দেখল। মোট ছেষট্টি টাকা। এত টাকা স্বাভাবিক নিয়মে ওর কাছে থাকার কথাই নয়।

একটু চিন্তিত হল যদু। ট্রেন ফেল হওয়ার ঘটনাটা কি বিশ্বাস করা উচিত? না। ঝন্টু কারণে তো বটেই, অকারণেও মিথ্যে কথা বলে। ওটাই ও অভ্যাস করে নিয়েছে। মিথ্যে বলে ধরা পড়লেও লজ্জা বা ভয় পায় না। বরং আর একটা মিথ্যে বানিয়ে নিয়ে আগেরটাকে চাপা দেয়। এ টাকাটার পিছনে যে ঘটনা আছে সেটা আপাতত জানবার উপায় নেই। চুরি ডাকাতি জুয়া সবই হতে পারে।

টাকাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে যদু বাজারে রওনা হল। ছেলেকে সিঁড়ির নিচে শুইয়ে ভুল কাজ হয়েছে। সুমিতবাবু শ্মশান থেকে ফেরার পর সিঁড়ির নিচে ঝন্টুকে দেখে প্রশ্ন করেছিল, ওখানে কে শুয়ে আছে?

যদু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলে, আমার ছেলে। ট্রেন ফেল হওয়ায় কাল রাতে বাড়ি যেতে পারেনি।

সুমিত অবাক হয়ে বলে, কিন্তু তাহলে ও এখানে শুয়ে আছে কেন? ওকে তো তোমার বিছানাতেই শোওয়াতে পারতে!

আছে থাক, ওর অভ্যাস আছে। গাঁয়ের ছেলে তো।

জবাবটা সুমিতের তেমন পছন্দ হয়নি। কিন্তু ঝন্টুকে ঘরে শোওয়ানো কতখানি বিপজ্জনক তা যদু জানে। কিন্তু এই যে সিঁড়ির নিচে শোওয়াল এটাও ভাল হল না। বিদঘুটে হল। কাজটা ঝন্টুও তো ভাল চোখে দেখবে না। তার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু কম নেই। কিছু একটা এঁচে নেবে।

বাজার থেকে ফিরে যদু দেখল, ঝন্টু উঠে বসে আছে। তাকে দেখেই বলল, বাবা, হাতমুখ কোথায় ধোবো?

বাড়ির পিছনে চলে যা। কল আছে বাগানে।

আর মাজন?

মাজন! আমরা তো সবাই টুথপেস্ট আর ব্রাশ দিয়ে মাজি। তা ব্রাশ তো আর দেওয়া যাবে না।

তাহলে তোমার পেস্টটাই দাও একটু।

বসে থাক। আসছি।

ঝন্টু অবাক হয়ে বলল, তোমাকে আবার এর জন্য নামতে হবে? চাবিটা দাও, আমিই নিয়ে নেবো'খন।

যদু চাবি দিল না। রোষকষায়িত চোখে ছেলেকে একবার দেখে নিয়ে ওপরে উঠে এল।

আজ ঘর-গেরস্থালীর কাজ কম। সুমিত অফিসে যাবে না। আর জল খাবারের রুটি ঝি-ই বানায়। তার স্বার্থ আছে। চার-ছ খানা রুটি সে আঁচলে ঢেকে বাড়ি নিয়ে যায়।

যদু চটপট আর এক দফা চা বানিয়ে ফেলল। সবাইকে দিয়ে এবং নিজে খেয়ে নিচে নেমে এসে দরজা খুলে বলল, যা, তাড়াতাড়ি সেরে নে।

ঝন্টু বিরক্ত হয়ে বলল, দরজাটা যে কেন খুলছিলে না। মানুষের হাগামোতাও তো আছে রে বাপু।

যদু ছেলের দিকে এমন চোখে তাকাল যে চোখে খুনী তাকায়, বাপ নয়।

বাথরুমে যত দেরী করতে লাগল ঝন্টু তত বাইরে দাঁড়িয়ে অস্থির হাতে চাবি নাচাতে থাকে যদু। ছেলেটার মতলব তার ভাল লাগছে না।

যদুর ঘরের কলিং বেল বেজে উঠল ক্র্যারারাং করে। ডাক এসেছে দোতলা থেকে। যদু উঁচু গলায় বলল, হল তোর?

ঝন্টুর হয়নি। শাওয়ারের শব্দ হচ্ছে। যদুর ডাক শুনতে পেল না।

ভারী উদ্বেগে পড়ে গেল যদু। ওপরে না গেলে নয়। অথচ ঝন্টুর হেফাজতে কয়েক মিনিটের জন্যও ঘরখানা ফেলে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

তাড়াহুড়োয় মাথায় যে বুদ্ধিটা এল তাই করল যদু। বালিশটা বগলে নিয়ে দোতলায় উঠে এল।

মৃগাঙ্ক বাবু ফোনে কারও কনডোলেন্স মেসেজ নিচ্ছিলেন। ফোনটা রাখতে রাখতে অবাক হয়ে বললেন, বগলে বালিশ কেন রে?

রোদে দেবো।

রোদে দিবি কেন?

জল পড়ে ভিজে গিয়েছিল।

সামনের বারান্দায় রোদ আসে। যদু একটা কাঠের চেয়ার রোদে টেনে নিয়ে গিয়ে বালিশটা রাখল। খুবই বিপজ্জনক এবং বিসদৃশ কাজ। চাকরের বালিশ সামনের বারান্দায় রোদে শুকোচ্ছে-এরকমটা হয় না। তার ওপর মৃগাঙ্কবাবুর নাকের ডগায়। ভরসার কথা, মৃগাঙ্কবাবুর রুচি হবে না যে, যদুর বালিশটা ছুঁয়ে বা নেড়েচেড়ে দেখবেন।

মৃগাঙ্কবাবু যদুর কাণ্ডটা স্থির চোখে দেখলেন। নিশ্চয়ই মনে মনে একটা কারণও ব্যাখ্যা করে নিলেন তবে যদু তেমন পরোয়া করল না। কাল রাত থেকে এই লোকটার ওপর তার সমীহের ভাবটা কেটে গেছে। লোকটাকে তার ঘেন্না হচ্ছে। ভীষণ ঘেন্না।

তাকে ডাকছিল সুমিত। কতগুলো প্যান্ট জামা দিয়ে বলল, এগুলো ইস্তিরি হবে।

আজই চাই?

হ্যাঁ, এখনই।

যদু ইস্তিরির প্লাগ লাগাল। জামা প্যান্ট ইস্তিরি করতে সময়ও গেল খানিকটা। আধ ঘন্টা বাদে আবার নীচে নামল সে। ঝন্টু টেরি কেটে তার বিছানায় বসে আছে।

বাবা, তোমার বালিশটা কোথায় গেল?

কেন?

ভাবছিলাম একটু শোবো।

শুবি? তুই শুবি কেন? তোর তো সকালে বাড়ি যাওয়ার কথা।

ঝন্টু ফিচেল হাসি হেসে বলল, রাতে তো ঘুমই হল না। ভাবছিলাম একটু জিরিয়ে নিয়ে যাই।

জিরোতে হবে না। এখন বাড়ি যা।

ঝন্টুর মুখ চোখের ভাব যদুর একেবারেই ভাল ঠেকছে না। ছোকরা এমনভাবে বালিশের কথা জিজ্ঞেস করল যে, বুকটা ব্যাঙের মতো লাফ মেরেছিল যদুর।

বড় খিদে পেয়েছে বাবা।

গিন্নীমা মারা গেছেন, এ অশৌচের বাড়ি, এখন খাবার-টাবারের ব্যবস্থা নেই। বাইরে খেয়ে নিগে যা।

ঝন্টু উঠল।

যদু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোর পকেটে অনেক টাকা দেখছি। এত টাকা কোথায় পেলি?

মায়ের ওষুধের টাকা।

এই বলে ঝন্টু তার বাপের চোখে চোখে তাকাল। যেন সেয়ানে সেয়ানে বোঝাপড়া হচ্ছে।

ঝন্টু চলে যাওয়ার পর যদু খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। মৃগাঙ্কবাবু বাথরুমে গেলে সে তার বালিশখানা এক ফাঁকে ঘরে রেখে আসতে গেল। শ্যামার মা ময়লা ফেলতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা।

সাত-সকালে তুমি একটা বালিশ নিয়ে ছোটাছুটি করছো কেন বলো তো। একটু আগে দেখলুম বালিশ নিয়ে দোতলায় উঠলে। এখন আবার নামছো।

যদু কী বলবে ভেবে পেল না। তবে সে বুঝতে পারছে যে, চালে বড্ড ভুল হচ্ছে। সে চোখে পড়ে যাচ্ছে লোকের। তার কপালটাই খারাপ, সে বলল, রোদে দিয়েছিলাম, ঘরে রাখতে যাচ্ছি।

এত তাড়াতাড়ি রোদে দেওয়া হয়ে গেল?

শ্যামার মা উঠে গেল। যদু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ি ভরে গেল আত্মীয়স্বজনে। প্রমিত তার বউ বাচ্চা সহ আমেরিকা থেকে এসে গেছে। বর আর বাচ্চা সহ সুমিতাও এসে গেল। সঙ্গে চাকর।

বাড়িতে তিনটে গাড়ি। একটা সুমিতের, একটা মৃগাঙ্কবাবুর, আর একটা ছিল গিন্নীমার। সেই গাড়িটা চালায় মান্তু। মান্তু অনেকদিনের লোক। তার কাছেই গাড়ি চালানো শিখেছে যদু। কাজের বাড়িতে চব্বিশ ঘন্টা গাড়ির দরকার বলে মান্তুকে বাড়িতেই থাকতে হুকুম দিলেন মৃগাঙ্কবাবু। কিন্তু থাকবে কোথায় মান্তু? সমাধান একটাই, যদুর ঘর। সুমিতার চাকর রামুয়াও থাকবে যদুর ঘরে। যদু তো আর আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু ব্যবস্থাটা তার পছন্দ হয় না।

দুপুরে খেয়ে এসে ঘরে যা দৃশ্য দেখল তাতে তার চক্ষু স্থির। মা[illegible] বিছানায় শোয়া, মাথায় বালিশ। ঘুমোচ্ছে। বেচারা ক্লান্তও। সারা সকাল শ্রাদ্ধের বাজার করতে হয়েছে, বুড়ো বুড়ি আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে আসতে হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন ডেরা থেকে। ফের পৌঁছেও দিয়ে আসতে হয়েছে কয়েকজনকে।

যদুর বুকে ঢিবঢিবানি উঠল। জলতেষ্টা পেতে লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই। মেঝেয় একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। বুকে বড় কষ্ট।

কে যেন কোথায় যাবে, মান্তুর ডাক পড়ল।

চোখ চেয়েই সে যদুকে বলল, এই বালিশে শোও নাকি? এঃ বাবা, এ যে ভীষণ শক্ত বালিশ। ভিতরে কী যেন খড়মড় করছিল।

যদু জবাব দেওয়ার জন্য হাঁ করল বটে, কিন্তু কোনো কথা এল না মাথায়। মান্তু অবশ্য তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না। বেরিয়ে গেল। যদু উঠে বালিশটাকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। এই দামী বালিশটা আজকাল সর্বক্ষণ তার দুঃস্বপ্নের কারণ।

দিন দুই বাদে একদিন যদু রান্নাঘরে ভারী ব্যস্ত। সকালের ব্রেকফাস্ট তৈরি হচ্ছে। এমন সময় দারোয়ান এসে খবর দিয়ে গেল, তোমার ছেলে এসেছে। নিচে বসিয়ে রেখেছি।

ছেলে। শুনেই যদু হাতের কাজ ফেলে দৌড়োলো নিচে। ঝন্টু! ফের এসেছে! সর্বনাশ! ও যে টাকার গন্ধ পায়।

কিন্তু নিচে এসে দেখল ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে পল্টু। মুখটা চুন।

কী রে?

একটা খবর দিতে এলাম। দাদা টাকা চুরি করে পালিয়েছে।

ঝন্টু?

হ্যাঁ।

রাগে দুঃখে যদুর হাত পা কাঁপছিল। হাত মুঠো পাকিয়ে সে নিজেকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে বলে, কত টাকা?

তুমি যে দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছিলে তার সবটা দিদি পুঁতে রেখেছিল শোওয়ার ঘরে.....

বিশু দরজায় দাঁড়িয়ে। দু'হাজার টাকার কথা শুনল নাকি। যদু চোখের ইশারায় চুপ করাল পল্টুকে। বলল, ঘরে আয়।

ঘরে এখনও তালা দেয় যদু। চাবি তার কাছে থাকে। দরকার মতো রামুয়া বা মান্তু চেয়ে নেয়। তবে যদু বাইরে গেলে চাবি রামুয়ার কাছে রেখে যেতে হয়। ওই সময়টায় ভারী উদ্বেগে কাটে যদুর।

বালিশটা তোশকের নিচে গুঁজে রাখা যাতে কারও নজরে না পড়ে চট করে। কিন্তু এইভাবে যে বেশীদিন চলবে না তা যদু বুঝতে পারছে।

পল্টুর কাছে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শুনল যদু। তারপর গুম হয়ে বসে রইল। ঝন্টুকে কাছে পেলে এখন সে খুন করতে পারে। কিন্তু খুন হওয়ার জন্য ঝন্টু যে হাতের কাছে এগিয়ে আসবে তেমন সম্ভাবনা নেই। এখন কিছুদিনের জন্য তার টিকিটিরও দেখা পাওয়া যাবে না।

যদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কপাল!

পল্টু একটু নিম্নস্বরে বলল, দাদা কিন্তু গাঁয়ের আশেপাশেই আছে।

যদু কঠিন চোখে চেয়ে বলল, কোথায়?

হরিহরের দলে ভিড়েছে। চুরি ছিনতাই করছে চারদিকে।

যদু মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি। পুরোপুরি লাইনে নেমে গেল তাহলে।

হরিহর শুধু চোরই নয়, চোর-ডাকাতদের সেই হল মাথা। যদু তাকে বহুকাল ধরে চেনে।

পল্টু একটু দ্বিধা করে তারপর বলল, মনীশবাবুর ক্যাম্পের চুরিটা হরিহরই করেছে বলে মনে হয়।

কিসের চুরি? বলে যদু অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকাল।

পল্টু পুরো ঘটনাটা বলল। যদু মাথা নেড়ে বলল, বাড়িতে আনাটা ঠিক হয়নি। এসেছে যখন ফেলাও যাবে না।

শাসনবাবু খোরাকী দিয়েছেন। মনীশবাবু আবার দীনেশবাবুর আত্মীয় তো। তাই।

যদু ছেলেকে বিদেয় দিয়ে উঠে এল ওপরে। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। কী করবে, কী করা উচিত তা বুঝতে পারছে না।

বড়লোকের বাড়িতে শোক না থাক শ্রাদ্ধ আছে। সেটা এলাহি ব্যাপারও বটে। বালিশের জন্য উদ্বেগ নিয়েই দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি যদুকে উদয়াস্ত ব্যস্ত রাখল। দুই ছেলের কেউই ন্যাড়া হল না, পুরুতকে তার বদলে মূল্য ধরে দিল। তারপর বসল দানসাগর করতে।

সে নিজে মরলে ঝন্টুও বোধহয় ন্যাড়া হবে না। শ্রাদ্ধই করবে কি না তাও বুঝতে পারছে না যদু। সংসার আজ যদুকে কান ধরে অনেক কিছু শেখাচ্ছে।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেল। নিয়মভঙ্গের পর প্রমিত ফিরে গেল আমেরিকায়। মেয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি। আত্মীয়স্বজনরা যে যার নিজের জায়গায়। বাড়ি ফাঁকা হল। সবচেয়ে বড় কথা, যদু তার নিজের ঘরখানা আবার ফেরত পেল। ফাঁকা ঘরে বসে যদু এক রাতে নানা কথা ভাবতে ভাবতে বালিশটায় হাত বোলাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, এখন যখন তার বেশ কিছু টাকা হয়েছে তখন আর কলকাতায় চাকরি আঁকড়ে পড়ে থাকার দরকার কী? সে দেশে ফিরে গেলে এখনও হয়তো ছেলেপুলেগুলো সবাই অমানুষ হয়ে যাবে না। পল্টুটাকে হয়তো বা সামাল দেওয়া যাবে। মনুর জন্য যদি একটা ভাল পাত্র জোগাড় করতে পারে তাহলে হাজার দশ পনেরো টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে। ঘরদোর পাকা করবে। কত কী করতে মন চায় যদুর। তবে টাকারও একটা মায়া আছে। কাছে থাকলেই ভাল লাগে। শরীরটা গরম থাকে।.....

মৃগাঙ্ক মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কল্পনার মৃত্যুটা তাঁকে একটু একা করে দিয়েছে বটে, কিন্তু একটা ভারও তো সরে গেছে। যতদিন কল্পনা স্বাভাবিক এবং সুস্থ ছিল ততদিন এক রকম, যেই ক্যানসার ধরা পড়ল অমনি শুরু হল নিরন্তর টেনশন, দিন গোনা, ক্রমে ক্রমে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখশ্রীতে পাণ্ডুরতার সঞ্চার দেখে ভয় পাওয়া। শূন্যতা নেমে এল বটে, কিন্তু মৃগাঙ্ক সামনে অনেকটা ফাঁকা জমিও পেলেন। কিছু স্বাধীনতা।

ষাট পার হলেও মৃগাঙ্কর স্বাস্থ্য এখনো দারুণ ভাল। শরীরে মেদ নেই, যথেষ্ট বলশালী তিনি। তার সবরকম খিদেই বেশ তীব্র। খাদ্য ও নারী তাঁর কাছে সমান ভোগ্যবস্তু আজও। কিন্তু সব ব্যাপারেই মৃগাঙ্কর সংযমও আছে। কল্পনা বেঁচে থাকতেও তিনি পরনারী গমন করেছেন বটে, তবে তাঁর বাছাবাছি ছিল। যাদের প্রতি মানসিক টান অনুভব করেছেন তাদেরই সঙ্গে লিপ্ত হয়েছেন। দীনেশের মতো নির্বিচার তিনি নন। মৃগাঙ্ক আসলে ভাড়াটে মেয়ে মানুষ পছন্দ করেন না, তিনি চান নিজস্ব মেয়েমানুষ। এখন আর অ্যাডভেনচারও তাঁর ভাল লাগে না। তিনি এক জায়গায় থামতে চান। তাঁর মনে হচ্ছে, অলকাকে নিয়ে তিনি বাকী জীবনটা চমৎকার

কাটিয়ে দিতে পারবেন।

কল্পনার শ্রাদ্ধের কয়েকদিন বাদেই মৃগাঙ্কর দিল্লী যাওয়ার দরকার পড়ল। কনসালটেনসির কাজে সারা ভারতেই ঘুরতে হয়। নতুন কিছু নয়। তবে এবার নতুন একটা মাত্রা যোগ করতে ইচ্ছে হল মৃগাঙ্কবাবুর। তিনি অন্য শহরে গেলে থাকতে হয় হোটেলে। ওই থাকাটা ভারী নীরস আর একঘেয়ে। দু-একবার কলগার্ল নিয়েছেন বটে, কিন্তু ওসব ব্যবসায়িক মেয়ের টাকা পয়সার সচেতনতা এত বেশী এবং ব্যবহার এত কৃত্রিম যে সেটা আরও যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। নিছক মেয়ে মৃগাঙ্ক পছন্দ করেন না। অথচ বড় ইচ্ছে করে সারাদিন কাজ করে কর্মক্লান্ত দিনান্তটি এক নয়া সহচরীকে নিয়ে কাটান। সেটা আজ অবধি হয়নি।

দিল্লী যাওয়ার আগের দিন দীনেশের বাড়িতে গিয়ে অলকাকে ধরলেন।

আমার সঙ্গে কাল একটু বাইরে যেতে পারবে?

অলকার চোখ ঝিকিয়ে উঠল, কোথায়?

দিল্লী।

দিল্লী! অলকা অবিশ্বাস ভরে চেয়ে থেকে বলল, সত্যি? আমি কলকাতা ছাড়া একটাও বড় শহর দেখিনি কখনো। সত্যি নেবেন?

নেবো বলেই তো বলছি। কিন্তু তোমার স্বামীর কী খবর?

অলকা গোঁজ হয়ে বলে, নতুন আর কী? সারাদিন খিটখিট করে। শরীরও ভাল না। সবই তো জানেন।

জানি। দিল্লী গেলে আপত্তি করবে না তো লোকটা?

ওর আপত্তিতে কী যায় আসে বলুন। বড়জোর গালাগাল দেবে একা একা ফেলে গেছি বলে। তবে মুখ বন্ধ করা যায়, যদি পেস মেকারের টাকাটা জোগাড় হয়।

পেস মেকারের টাকা দেওয়া হবে। ওকে সেকথা বোলো।

বলেছি।

মুশকিল হল, আমি ইচ্ছে করলেই ক্যাশ টাকায় হাত দিতে পারি না। আমার সব টাকাই কোম্পানিতে খাটছে। ক্যাশ যা ছিল তা খরচ হয়েছে কল্পনার চিকিৎসায়।

অলকা উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আপনি কি এখন টানাটানির মধ্যে আছেন?

মৃগাঙ্ক হেসে মাথা নেড়ে বলেন, না রে বোকা, না। টানাটানি নয়; এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টের ব্যাপার। হঠাৎ করে পনেরো বিশ হাজার টাকা অন্য খাতে তুললে অডিট ধরবে। তবে উপায় একটা হয়তো আছে।

কী উপায়?

বলব'খন। কাল বিকেলে প্লেনে বসে।

প্লেন! বলে অলকা বিস্ময়ে নিথর হয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক বললেন, প্লেনে চড়োনি বোধহয়?

না। চড়ার কথা কল্পনাও করতে পারিনি।

ঠিক আছে, অভিজ্ঞতাটা তাহলে হোক। টিকিট কাটা থাকবে, তুমি ট্যাক্সি করে দমদম চলে যেও। পারবে তো!

ওমা! পারব না কেন?

মৃগাঙ্ক তৃপ্ত বোধ করলেন। আয়ু ফুরিয়ে আসছে। এখন এই শেষ ক'টা বছর যদি এক জায়গায় নোঙর ফেলে কাটানো যায়। অলকাকে তাঁর ভারী ভাল লাগে। কেন লাগে তার বিচার তিনি কখনো করবেন না।

সিদ্ধান্তটি দীনেশকেও বলতে হল। এখনো অলকা তাঁর একার নয়। তার ওপর অলকার প্রথম প্রোমোটার তো দীনেশই। ওরও অধিকার আছে। মতামত আছে।

দীনেশ শুনে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাতটা নেড়ে বলে, তোর আর উন্নতি হল না। একটা নতুন ভাল জিনিস আসছে, অলকা তো পুরোনো কাসুন্দী।

মৃগাঙ্ক হাসলেন। বললেন, নতুন মেয়ে সেট হতে সময় লাগবে। অলকা পুরোনো বলেই সেট হওয়া। বিশ্বস্ত। আমার চলে যাবে।

একটা কথা বলে দিই। এখন বউঠান নেই, তাই বলছি। অলকাকে আবার বিয়ে-টিয়ে করে বসিস না। তুই তো বরাবর এ ব্যাপারে গাড়ল।

আরে না।

আরও একটা কথা আছে। সেটা বলব কি না ভাবছি।

ভাবছিস কেন?

প্রেমের দুধ না ছানা কেটে যায়।

যাবে না।

অলকার স্বামীর সঙ্গে আমি দেখা করেছি। লোকটা বলল, ও তোদের পাড়ায় থাকত একসময়ে। ইলেকট্রিকের কাজ করতে তোর বাড়িতেও যেত। আর যদুর সঙ্গে অলকার নাকি একটা সফট্ সম্পর্ক ছিল।

মৃগাঙ্ক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ সময় নিলেন সামলাতে। বললেন, যদুর সঙ্গে?

ব্যাপারটা তোকে বোধহয় আগেই বলা উচিত ছিল। মায়া হল বলে বলিনি।

মৃগাঙ্ক ফের স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, যদুর সঙ্গে।

দীনেশ মাথা নেড়ে বলল, ব্যাপারটা দু ভাবে নেওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশে তো আর বাবু-চাকরে কোনও ভেদ নেই। আমরাও তো বিলেতে সেই টেনিস ক্লাবের বল বয়ের বোনের সঙ্গে প্রেম করতাম। ওটা না ধরলেই হয়।

মৃগাঙ্ক ফর্সা মানুষ। একটু লাল হলেন। তারপর বললেন, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছিল?

ঝড়ুয়া তো অনেক দূরের কথাই বলল। তবে আমার ততটা বিশ্বাস হয় না। শালা বউয়ের নামে বানিয়েও বলতে পারে, এখন খাড় আছে। তবে হৃদয়ঘটিত কিছু একটা হয়েছিল বোধহয়। মৃগাঙ্ক স্বাভাবিক বোধ করছিলেন না। কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। মনে মনে পিছোচ্ছেন।

দীনেশ নিমীলিত নয়নে বন্ধুর অস্বস্তি লক্ষ করে বলে, যদু চাকর হলেও কায়স্থ, আমার দেশের লোক, স্বজাতি। একসময়ে তারা রীতিমতো ভদ্রলোকও ছিল।

মৃগাঙ্ক কথাটা কানে না তুলে বললেন, এই ঘটনা জানার পর থেকেই কি তুই অলকাকে তাড়ানোর ডিসিশন নিয়েছিস?

দীনেশ শান্ত গলায় বলে, আমি একটু প্রাচীনপন্থী। ক্লাস মানি। হ্যাঁ, সেই জন্যই।

মৃগাঙ্ক নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ঘটনাটা কত পুরোনো?

বছর চারেক তো বটেই। কিন্তু তোর অত খতেনে দরকার কী? মেয়েমানুষ হল স্রোতের জল, ডুব দিয়েই উঠে পড়বি। অতসব ঘিনপিত থাকলে কি চলে?

তাহলে আমাকে ঘটনাটা বললি কেন?

বললাম, যদুকে নিয়ে একটু ভাবতে হচ্ছে বলে। শাসনের কাছে খবর পেলাম যদু নাকি কদিন আগে দেশের বাড়িতে দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছে। শুনে খটকা লাগল। হঠাৎ দু'হাজার টাকা ও পেল কোথায়? ওর যা আয় তাতে তো সম্ভব নয়। অবশ্য ধার-টার করে থাকতে পারে। তবু বলে রাখলাম।

মৃগাঙ্ক একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, আমি যদুকে নিয়ে ভাবতে রাজি নই। ওসব কথা থাক। অলকার সঙ্গে যদুর সম্পর্ক কতটা ছিল তা কী করে জানা যাবে?

দীনেশ মাথা নেড়ে বলে, কতগুলো জিনিস কোনোদিনই জানা যায় না। মিয়া-বিবি কেউ তো কবুল করবে না। ও নিয়ে কেন মাথা গরম করছিস? বরং যদুর ওপর একটু নজর রাখ। ওকে আমি দিয়েছিলাম তোর বাড়িতে, আমার একটা দায়িত্ব আছে।

মৃগাঙ্ক প্রগাঢ় চিন্তিত মুখে উঠে পড়লেন।

পরদিন দিল্লীর প্লেনে পাশাপাশি বসে অলকাকে মৃগাঙ্ক সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের চাকর যদুকে তুমি কি আগে চিনতে?

অলকা জীবনে প্রথম প্লেনে চড়েছে। তার উত্তেজনা, শিহরন সব সুন্দর মুখখানায় ক্ষণে ক্ষণে নানা বর্ণের সঞ্চার করছে। একহাতে সে খামচে রেখেছে মৃগাঙ্কর কবজি। আকাশে ত্রিশ হাজার ফুট শূন্যতায় ভাসছে সে। অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য। মৃগাঙ্কর কথাটা ভাল শুনতে পেল না সে। কেবল বলল, কে যদু?

মৃগাঙ্ক একটা গাঢ় শ্বাস ফেলে বললেন, যদুর কথা তোমার মনে নেই?

অলকার হঠাৎ মনে পড়ল। সে মৃগাঙ্কর দিকে চেয়ে বলল, যদু? মানে আপনার বাড়ির চাকর?

হ্যাঁ।

চিনবো না কেন? ও পাড়ায় তো ছিলাম আমরা।

কিরকম চিনতে?

আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ ছিল।

আর কিছু?

আর কী? বলে অলকা সভয়ে মৃগাঙ্কর দিকে চেয়ে রইল।

সেটাই জানতে চাইছি।

অলকা মাথা নেড়ে বলল, আর কিছু নয়। তবে লোকটা আমাকে একটু জ্বালাতন করত মাঝে মাঝে।

অলকা সামলে গেল। যদুর কথাটা যে উঠতে পারে কখনো তা তার আন্দাজ ছিল। সে এও জানে, সব ঘটনা পুরোপুরি অস্বীকার করতে নেই। খানিকটা স্বীকার করে বাকিটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। ঠেকে শিখেছে।

কি রকম জ্বালাতন?

অলকা মুখ টিপে হেসে বলল, কুঁজোর যেমন চিত হয়ে শোওয়ার শখ হয়, ওরও হত। আমরা গরীব ছিলাম তো, তাই সমান ভাবত।

তুমি কী করতে?

ফিরেও চাইতাম না। কপালদোষে গরীবঘরে বিয়ে হয়েছিল আমার, নইলে এসব বাজে লোক সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা কেন করবে বলুন!

তোমার স্বামী দীনেশকে কী বলেছে জানো? বলেছে তোমার সঙ্গে যদুর নাকি একটা সফট্ সম্পর্ক ছিল।

আমার স্বামী কত কিছুই তো বলে। আমার মরণ কামনা করে ঠাকুর দেবতাকে ডাকে। ওর কি মাথার ঠিক আছে? যদুর সঙ্গে সম্পর্ক! মাগো! ভাবতেও পারি না।

অলকার চোখ জলে ভরে আসছিল। মৃগাঙ্ক তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি। তুমি যে কেন তোমার ওরকম বদ স্বামীটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও সেটাই বুঝতে পারি না।

মরলে বিধবা হবো যে! সেটা ভারী বিশ্রী!

মৃগাঙ্ক হাসলেন, ও মরলে তুমি বিধবা হবে কেন?

অলকা ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, হবো না, না? আসলে আমি শাস্ত্রটাস্ত্র জানি না তো। কী থেকে কী হয় কে জানে বাবা।

মৃগাঙ্ক অলকার হাতে আবার একটু চাপ দিয়ে বললেন, যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন তুমি বিধবা হবে না।

আপনি অনেক দিন বেঁচে থাকুন।

মৃগাঙ্ক পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, তা বলে আমি হৃদয়হীন নই। তোমার স্বামীর পেসমেকারের টাকা ঠিকই দেবো।

আপনি তো অনেক দিচ্ছেন। প্লেনের কত ভাড়া, হোটেলের খরচ ...

এ সব কোম্পানির টাকা।

তবু আপনি অনেক করেছেন।

মৃগাঙ্ক চোখ খুললেন না। কল্পনার জমানো টাকা ঘরের কোথায় রাখা আছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তাই তো!

।। নয় ।।

মাঝরাতে একটা ভয়ঙ্কর চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল মনীশের। কে যেন অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ঘটিবাটি আছড়ে পড়ার আওয়াজ। ঘুমচোখে তার প্রথম মনে

হল, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

আজকাল সে হাতের কাছে একখানা লাঠি রেখে শোয়। সেখানা নিয়ে মনীশ লাফিয়ে উঠল। একটা হারিকেন নিবুনিবু করে রাখা ছিল ঘরে। সেখানা উসকে সে হুড়কো খুলে বেরোলো।

উঠোনে একটা কলসী আর কয়েকটা বাসন পড়ে আছে। ওপাশের ঘরের দরজা খোলা। দাওয়ায় পল্টু, মন্টু আর মনু দাঁড়ানো জড়োসড়ো হয়ে। ঘর থেকে সেই লোকটার চেঁচানি শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে মনুর মায়ের কান্নার শব্দ।

লোকটা পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে বলছে, এইসব গর্ভস্রাবকে জুতিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হয়। তোমাকে বলছি, সাতহাত মাটির তলায় ওকে পুঁতে তবে ছাড়ব। জ্যান্ত পুঁতব।

উঠোনটা পার হয়ে হরিণপায়ে মনু এপাশে চলে এল। মনীশ কিছু বলার আগেই উত্তেজিত ফিসফিসানিতে বলল, বাবা এসেছে একটু আগে। খুব রেগে আছে দাদার ওপর। অতগুলো টাকা-! আপনি ঘরে যান। এসব শুনবেন না। পায়ে পড়ি।

মনুর গলায় এমন একটা আকৃতি ফুটল যে মনীশের ভারী মায়া হল। এ মেয়েটাকে আজই সে ইতিহাস পড়াচ্ছিল। কী চমৎকার মাথা আর স্মৃতিশক্তি! এর বাপটা তাহলে অত খারাপ খারাপ কথা বলে কী করে?

মনীশ পিছিয়ে ঘরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তবে শুতে গেল না। চেয়ারে বসে রইল গুম হয়ে।

লোকটার রাগের যে কারণ নেই তা নয়। গরীব মানুষ, কষ্টেসৃষ্টে, হয়তো ধারকর্জ করে দু'হাজার টাকা জোগাড় করেছিল, অমানুষ ছেলেটা চুরি করে ভেগেছে। তাহলেও লোকটা যে মনুর বাবা সেকথা মনীশ ভোলে কী করে?

মনীশ হঠাৎ শুনতে পেল, মনু তার বাবাকে সামলাচ্ছে, বাবা, এবার চুপ করো। দীনেশবাবুর আত্মীয় রয়েছে বাড়িতে, ভুলে গেলে?

একথায় যদু হঠাৎ চুপ করল। একটু বাদে যদুর কান্নার শব্দ শুনতে পেল মনীশ। কাঁদতে কাঁদতে এক পর্দা নিচু গলায় যদু বলছে, শুয়োরের বাচ্চা, খানকীর ছেলে আমার রক্তজল করা অতগুলো টাকা মেরে চলে গেল...তোমার পেট না আস্তাকুঁড়? ওই গর্ভ থেকে এসব জঞ্জাল জন্মায় কেন? অ্যা? ....

মনীশ ঘরে বসেই কানে আঙুল দিল।

উঠোন থেকে কেউ বাসনকোসন কুড়িয়ে নিচ্ছে। মিষ্টি চুড়ির শব্দ। সেই সঙ্গে ফিসফাস কথার আওয়াজ। মনীশ হারিকেনটার কল ঘুরিয়ে আলো কমিয়ে দিয়ে বিছানায় ঢুকল। তার শরীর দুর্বল। অনেকটা রক্ত চলে গেছে। সেই ক্ষতিটা এখনো পূরণ হয়নি।

অনেক রাত অবধি মনীশ ঘুমোতে পারল না। জেগে থেকে শুনল, ওপাশের ঘরে যদুর কান্না থেমে এল। এখন একটু তপ্তস্বরে কথাবার্তা হচ্ছে। সম্ভবত কিছু খাবেও যদু।

মনীশ ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে যদু এসে হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, মনীশবাবু, ভাল আছেন?

যদুর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাকে কয়েকবার দেখেছে মনীশ। সে বলল, হ্যাঁ,আপনি ভাল?

যদুকে এই যে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে কথা বলছে মনীশ এটা স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব ছিল না।

যদু মনীশের উল্টোদিকে চেয়ারে বসে বলল, একটা জমি বায়না করতে আসতে হল। আজই চলে যাবো। তা শুনলাম আপনাকে নাকি চোর খুব মেরেছে?

মনীশ মৃদু হেসে বলল, খুব। বাঁচাই মুশকিল ছিল। আপনাদের আশ্রয় না পেলে-

কী যে বলেন! এ তো কর্তব্যই। গাঁ-গঞ্জও বড় খারাপ জায়গা হয়ে গেছে। আগের মতো নেই। ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য।

তাই দেখছি।

তবু আমরা আর কোথায় যাবো বলুন। শহর হল বড়লোকদের জায়গা।

মনীশ চুপ করে থেকে কথাটা একরকম মেনে নিল।

রহিমের জমিটা সস্তায় পাচ্ছি বলে নিলুম। শহরের তোলা টাকায় আর চলে না। গাঁয়ে যাহোক ধানটা-আঁশটা হয়, পেট তো চলে।

তা তো ঠিকই। সবাই গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিলে কি করে চলবে?

কলকাতায় কাঁচা লঙ্কা দশ টাকা কিলো। ভাবতে পারেন? আমাদের মতো লোকের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। ভেবেচিন্তে দেখলাম, গাঁয়েই জমি বাড়ানো ভাল। শহর আমাদের দেখবে না।

তা তো ঠিকই। আপনি ঠিক কাজই করেছেন।

যদু কাছে এসে তার ক্ষতস্থানটা ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থাতেই দেখে বলল, ইস, মাথায় মেরেছে। কংকাশনটা যে হয়নি সেই ঢের। আর একটু এদিক ওদিক হলেই হয়ে যেতে পারত।

"কংকাশন" শুনে মনীশ একটু হাসল। শহরের প্রভাব।

যদু নিজে থেকেই বলল, আপনি এখানেই থাকুন। যতদিন ইচ্ছে। মনুটাকে মানুষ করে দিয়ে যান। এরা তো ভদ্রলোকের সঙ্গ পায় না, দেখনে তো কী হাল! আপনি থাকলে একটা বল-ভরসা পাবো।

কিন্তু আমার তো বেশীদিন থাকার উপায় নেই। আমার তো কাজ আছে।

শুনেছি গাঁয়েই আপনার কাজ! টানা না থাকলেও মাঝে মাঝে এসে যদি থাকেন তো তাতেই আমার মনুটা দাঁড়িয়ে যাবে। মেয়েটা লেখাপড়ায় বড় ভাল ছিল।

এখনো আছে। পড়লে ভাল রেজাল্ট করবে।

যদুর চোখ কন্যাগর্বে ছলছল করে। ধরা গলায় বলে, আপনি আশীর্বাদ করবেন, তাতেই হবে। আপনি দীনেশবাবুর আত্মীয়, তিনি আমার অন্নদাতা। আপনার মতো মানুষকে মাথায় করে রাখতে হয়।

মনীশ মৃদু হেসে বলল, একথা শুনলে দীনেশবাবু কিন্তু খুশি হবেন না। তিনি আমাকে পছন্দ করেন না।

কী যে বলেন! বলে যদু একটু অধোবদন হল। তারপর মুখ তুলে বলল, কাল রাতে মাথাটা বড্ড গরম ছিল, আপনার ঘুমের ভারী ব্যাঘাত হয়েছে।

ও কিছু নয়। এ বাজারে দু'হাজার টাকা তো সোজা নয়।

আপনারও তো কত গেল। সবই কপাল। ঝন্টুর নামে পুলিশে একটা ডায়েরি করাব ভাবছি।

ছেলের নামে! মনীশ ভ্রূ তুলল।

যখন ছেলে ছিল তখন ছিল। এখন কি আর ছেলে আছে? লায়েক হয়ে মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। শোনেননি তার গুণের কথা? হরিহরের দলে ভিড়েছে। হরিহর একটা সাংঘাতিক ভিলেন লোক।

আমি চিনি না।

চিনে কাজও নেই। আপনি বরং বিশ্রাম করুন, আমি ওদিকটা ঘুরে আসি। আজই কলকাতা ফিরতে হবে। বাবু দিল্লী যাওয়ায় একদিনের ছুটি পেয়ে এসেছি।

যদু চলে যাওয়ার পর মনীশ উঠোন ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ পেয়ে বাইরে এল। ধান শুকোবে বলে উঠোন পরিষ্কার করছে মনু। মেয়েটা সারাদিন কাজ করে। এত ঘরের কাজ করলে পড়বে কখন?

আজ পড়বে না মনু?

আজ থাক।

কেন, থাকবে কেন?

বাবা এসেছে। আজ আমার ছুটি।

তোমার বাবা তো বেরিয়ে গেলেন। জমি বায়না করে ফিরে যাবেন আজই।

আচ্ছা বাবা, যাচ্ছি। আগে মুড়িটুড়ি খান, তারপর পড়ব।

মেয়েটার একটা নিজস্ব হাসি আছে। সেটা যখন হাসে তখন দুনিয়া ওলটপালট করে দেয়।

মনীশ ঘরে এসে বসে নিজের ভবিষ্যতের একটা প্ল্যান করতে লাগল। প্ল্যান অবশ্য করা গেল না। হিজিবিজি হয়ে যেতে লাগল। ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার, অনিশ্চিত। দৈবক্রমে কিছু ঘটে

না গেলে অন্যরকম কিছু হবে না।

আধ ঘন্টা বাদে মনু সসঙ্কোচে পড়তে এল। একটু সেজেই এসেছে, গরীবের ঘরে যতটা সাজা যায়। শাড়িটা কাচা, চুল আঁচড়ানো এবং বেণীতে বাঁধা, চোখে একটু কাজল, কপালে টিপ, সামান্য সস্তা পাউডারের প্রলেপ রয়েছে মুখে। এইটুকুই। তবু নজরে পড়ে এবং মনীশ খুশি হয়। মনুর এই সাজটুকু মনীশকে লক্ষ্য করেই।

এই মেয়েটিকে পড়াতে পড়াতে মনীশ এমন একটা আনন্দ পায় যা আর কখনো কোনো কাজে পায়নি। এই অবস্থায় গরীব মেধাবী মেয়েটিকে যদি সে কৃতিত্বের সঙ্গে কলেজের বেড়া পার করে দিতে পারে তাহলে সে ভীষণ খুশি হবে। সেটা হবে মেয়েটিকে নতুন করে সৃষ্টি করার মতো।

মনু পড়াশুনা পছন্দ করে বটে, কিন্তু কথা বলাও তার ভীষণ পছন্দ। পড়ার বাইরেও কত কী আছে তার জানার।

আচ্ছা, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন বলুন তো? মা, বাবা, আর কে?

খুব বেশী কেউ নেই। মা বাবা আর আমার এক বোন।

তার বিয়ে হয়নি?

না।

কত বয়স?

তোমার চেয়ে কিছু বড়।

আপনি সত্যিকারের কী করেন বলুন তো! লোকে বলে আপনার নাকি মূর্তি চুরির ব্যবসা। সত্যি?

মনীশের মুখটা একটু ম্লান হয়ে যায়। তবু সে জোর করে হেসে বলে, কে বলেছে বলো তো।

সবাই বলে। চরণগঙ্গার হালদারদের দশমহাবিদ্যা মূর্তিগুলো নাকি আপনিই নিয়েছেন?

তা নিয়েছি। তবে চুরি বলা যায় না। ছোটো হালদারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলাম।

কিন্তু অন্য তরফরা তো জানে না। তাছাড়া দেড়শ বছর ধরে পূজো হয়ে আসছে, জাগ্রত বিগ্রহ।

মনীশ আবার হাসল, আমাদের দেশের লোক মূর্তির মূল্য বোঝে না। ফুলজল দিয়ে মূর্তিগুলোর বারোটা বাজাচ্ছিল। আমি একজন কালেকটারকে দিয়েছি। সে যত্নে রাখবে।

কিন্তু কাজটা তো খারাপ।

মনীশ একটু গম্ভীর গলায় বলে, সেইজন্য আমার ওপর তোমার ঘেন্না হয় না তো!

মনু অবাক, ঘেন্না! ঘেন্না হবে কেন? তবে ভারী রাগ হয়।

রাগ হয়? আমি চোর বলে?

মনু মাথা নেড়ে বলে, দাম দিয়ে কেনেন আপনাকে চোর বলতে যাবো কেন? লোকে বলে তাই বললাম। আমার ভয়, ভগবান আপনাকে যদি শাপ দেন।

মনীশ হেসে ফেলল, ভগবান শাপ দেবেন না, বরং আশীর্বাদ করবেন। মূর্তিগুলো যারা অবহেলায় আর অতি-ভক্তিতে নষ্ট করেছে তাদেরই শাপ দেওয়া ভগবানের উচিত।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই যে আপনাকে একটা চোরে এসে মারল এও ভগবানেরই শাস্তি।

কথাটা মন্দ বলোনি তো! আমি ভেবে দেখব।

যদি ধরুন আপনার মনে হয় যে, আমি ঠিক কথাই বলেছি তাহলে কী করবেন?

তাহলে এ ব্যবসা ছেড়ে দেবো।

ছেড়ে দিয়ে?

তোমার সেই বটকেষ্ট মাস্টারের মতো ছেলে পড়ানোর চাকরি নেবো। গাঁয়ে গঞ্জে জুটেও যাবে চাকরি।

মনু একটু ঝেঁঝে উঠে বলে, তার নাম মোটেই বটকেষ্ট নয়। শচীনবাবু।

ওই হল।

মনু হেসে ফেলে বলল, শচীন যে কী করে বটকেষ্ট হয়ে গেল সেটা তো বুঝলাম না।

আপনার মেমরি তো ভাল নয়।

লোকটাকে বটকেষ্ট ভাবতেই আমার ইচ্ছে করে।

আচ্ছা বাপু, না। হয় তার নতুন একটা নাম দেওয়া গেল। বটকেষ্ট।

বাঁচালে।

কেন বলুন তো!

তোমার খাতিরের শচীনবাবুকে যতক্ষণ না হেলাফেলার বটকেষ্ট বানানো যাচ্ছিল ততক্ষণ অবধি তোমার ঘাড় থেকে ভূতটা নামতে চাইছিল না। এবার নামবে।

মনু হিহি করে খানিকক্ষণ হাসলো। এ সেই নিজস্ব হাসি। তারপর বলল, যা সব পাগুলে হাসির কথা আপনার মাথায় আসে!

মনীশ ভারী খুশি হল। এই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের রসিকতা যে এই গেঁয়ো মেয়েটা ধরতে পেরেছে এটা যেন মস্ত কৃতিত্ব।

আচ্ছা, আপনাকে কি মাস্টারমশাই বলে ডাকতে হবে?

কেন বলো তো!

মাস্টারমশাই বলে না ডাকলে যে আমার পড়ায় মন বসবে না।

বটকেষ্টকে তাই ডাকতে তুমি?

মনু হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল, তাই ডাকতুম।

মাথা নাড়ল বলে কানে দুটো রিং ঝিকমিক করে উঠল। কই, গতকাল তো মনীশ ওর কানে এরকম ঝকমকে রিং দেখেনি। ভারী ভাল দেখাচ্ছে।

মনীশ না বলে পারল না, তুমি কানে গয়না পরেছো নাকি?

মনু ভারী অহংকারী মুখ করে মাথা নীচু করল, বাব্বাঃ আপনি কত কী লক্ষ করেন! মেয়েদের গয়নাও!

মনীশ অন্যমনস্ক হয়ে বলল, আমি যে মূর্তিচোর। কোথায় কী আছে, না আছে কী ছিল, কী নেই এইসব লক্ষ করতে করতে চোখ দুটোই কেমন চোরের মতো হয়ে উঠেছে। সব কেবল চোখে পড়ে যায়।

মনু হেসে বলল, ভালই তো। তবে চোরের চোখ বলছেন কেন? চোরের যেমন চোখ থাকে, পুলিশেরও থাকে।

আমি তো চোরই। তুমিই না একটু আগে বললে!

মনু আবার তার নতুন রিং ঝিকিয়ে মাথা নাড়ে; লোকে বলে তাই বলেছি।

কমবেশী আমরা সবাই চোর। তুমি বললে ঠিকই বলতে। এবার বইপত্র খোলো।

আজ কেন যেন পড়তে ইচ্ছে করছে না।

কেন?

আজ পাড়া বেড়াতে ইচ্ছে করছে। বলেই মনু মুখ লুকালো।

রোজ তো পাড়া বেড়াও।

সত্যি কথা বলব?

বলো।

বাবা বউবাজারের নামী দোকান থেকে রিং দুটো কাল কিনে এনেছে। খাঁটি সোনার রিং। চার আনা সোনা।

ভারী অহংকার ফুটল মনুর মুখে। ফুটবারই কথা। যাদের হাঁড়ি চড়ে না তাদের কানে হঠাৎ চার আনা সোনা উঠলে হতেই পারে। মনীশ হেসে বলল, দুল দেখাতে বেরোবে বুঝি?

মনু মুখ লুকিয়ে খুব হাসল।

তাহলে যাও। আজ দুল আর তোমার বাবার অনারে ছুটি।

মনু বইখাতা গুছিয়ে নিল। কিন্তু টপ করে চলে গেল না। বসে রইল। তারপর ধীর গাঢ় স্বরে বলল, বাবা একটা খুব ভাল চাকরি করে তো। সবে চাকরিটা পেয়েছে। পরে আরও উন্নতি হবে। আমি খুব পয়মন্ত বলে চাকরির প্রথম টাকা থেকে জমিয়ে জমিয়ে এই দুল কিনে এনেছে।

শুধু তোমার জন্যই আনলেন?

তা কেন? সবার জন্যই কিছু না কিছু এনেছে। শাড়ি জামা প্যান্ট, কত কী!

মনীশ এককথায় খুশি হল। কারও উন্নতির খবর পেলে সে খুশিই হয়। মানুষের পরাজয়, গ্লানি, দারিদ্র্য, আনন্দহীনতার খবর সে পছন্দ করে না।

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খুব ভাল।

বসে একটু গল্প করব আপনার সঙ্গে? পড়ব না কিন্তু।

এই যে পাড়া বেড়াতে যাবে বললে!

মনু তার নতুন দুল ঝিকিয়ে, চুলের ঝাপটা খেলিয়ে ভারী সুন্দর একখানা অসহায় মুখ করে বলল, যেই বইখাতা গোছালুম অমনি ইচ্ছেটা চলে গেল।

তাহলে এখন কী করবে?

আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে।

বুঝেছি। তোমার চোখে মুখে আজ ফাঁকির ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি। বটকেষ্টর সঙ্গেও এরকম পড়া ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দিতে নাকি?

আহা বটকেষ্ট তো আর বাড়িতে এসে পড়াত না। যা গোমড়ামুখো লোক, আড্ডা দেবো কী, চোখের দিকেই তাকাতুম না। আচ্ছা বটকেষ্টর ওপর আপনার এত রাগ কেন বলুন তো! ভারী হিংসুটে হয়েছেন।

রাগ কেন হবে?

এত রাগ যে নামটা পর্যন্ত বদলে দিয়েছেন। বলে খুব হিহি করে হাসল, বটকেষ্ট! বটকেষ্ট! মা গো! কোথায় শচীনবাবু আর কোথায় বটকেষ্ট!

শচীনবাবু নামটা কি তোমার খুব পছন্দ?

অন্তত বটকেষ্টর চেয়ে তো ভাল।

আর আমার নামটা কেমন?

মনীশ! ও বাবা, এ তো ভীষণ শহুরে নাম।

একটু মহিষ-মহিষ ভাব আছে, তাই না?

নামে নেই, তবে স্বভাবে আছে। আপনার ভীষণ গোঁ।

দিব্যি কথার পিঠে কথা বলে মেয়েটা। চালাক চতুর। গেঁয়ো হলেও বুদ্ধি আর হাজির-জবাব দেখে মনীশ মনে মনে ভারী খুশি হয়। শহরে মানুষ হলে অনেক মেয়েকে হার মানাত।

মনীশের চোখে মুগ্ধতা আর বিস্ময়টা বোধহয় মনুও ধরতে পারল। তাই আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারল না লজ্জায়। পুরুষের চোখের লেখা মেয়েরা টপ করে পড়তে পারে। তাই কন্টকিত শরীরে মনু উঠে পড়ল। বলল, যাই, এবার সত্যিই পাড়া বেড়িয়ে আসি।

মনীশ বলল, শোনো মনু।

মনু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল। কানের দুল ঝিকিয়ে উঠল।

মনীশ গম্ভীর হয়ে বলল, খুব বেশী দেখানোর দরকার নেই। সোনা-টোনা তোমাদের ঘরে নিরাপদ নয়।

মনু একটু যেন ভয় পেল। বলল, সে তো জানি, কিন্তু-

কথাটা কেন যেন শেষ হল না। কিন্তু মনীশের সতর্কবাণী বৃথাও গেল না। সেটা সত্যি হয়ে দেখা দিল অনেক রাতে।

যদু জমি বায়না করে কলকাতায় ফিরে গেল বিকেলে। আর গভীর রাতে আচমকা ক্রুদ্ধ গর্জন ও দুপদাপ শব্দে ঘুম ভাঙল মনীশের। আজও কে যেন কাকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল দিচ্ছে। সেইসঙ্গে মনুর মায়ের ক্ষীণ কান্নার সঙ্গে বিলাপের শব্দ।

মনীশ লাফিয়ে উঠে দরজা খুলল। হাতে টর্চ আর লাঠি।

উঠোনের ওপাশে মনুদের ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে হারিকেন জ্বলছে। লম্বা লম্বা ছায়া নড়ছে ঘরের মধ্যে।

একটা পুরুষ গলা বলে উঠল, চোর আমি একা? ও শালা চোর নয়? শালা শুয়োরের বাচ্চা বালিশের মধ্যে টাকা লুকিয়ে রেখেছিল, আমি ঠিক টের পেয়েছি। বাপ হয়ে শালা ছেলেকে সিঁড়ির নীচে সারা রাত শুইয়ে রাখল, ঘরে এত বড় তালা লাগিয়ে। কী চাকরি করে খুব জানি,

অফিসের পিওন, তার এত টাকা আসে কোত্থেকে শুনি? সোনার দুল, বাঁধানো পলা, আংটি, সাক্সের জিনিস, শাড়ি, ইয়ার্কি পেয়েছো? আমার কাছে ন্যাকড়াবাজি? আবে এই শালী, খোল দুল; নইলে কান ছিঁড়ে নেবো।

মনুর মা ককিয়ে উঠে বলল, আমারও মরণ হয় না। ও মনু, দে খুলে দুল জোড়া! ও খুনে ডাকাত, দেখছিস না চোখ মুখ ভাল নয়!

আর টাকা! টাকা কোথায় শীগগীর বের করো। ওই খানকীর ছেলে আজ জমি বায়না করে গেছে। সব জানি। আমার সময় নেই কিন্তু মা, দেরি করলে ঘরে আগুন দিয়ে যাবো।

মনীশ আচমকাই দেখতে পায়, অন্ধকারে উঠোনের এক কোণে কচু গাছের পাশে দুটো লোক দাঁড়িয়ে। মনীশ টর্চটা মারতেই দু'জনের হাতেই মস্ত দুটো চপার ঝিকিয়ে উঠল। পিছনেই মস্ত মস্ত পাতার কচুবন। টর্চ জ্বলতেই দুজনে পাতার আড়ালে সরে গেল। কিন্তু পালাল না। একজন চাপা গর্জন করে বলল, বাতিটা নেবান।

মনীশ বাতিটা নেবাল। তবে ওদের কথায় নয়, নিজের প্রয়োজনে। দু'জনের একজনকে সে চিনতে পেরেছে। এই সেই চোর যে তার তাঁবুতে ঢুকে মূর্তিগুলো চুরি করে আর তাকে মেরে আধমরা করে যায়। তাহলে এরাই হরিহরের দল, আর ও ঘরে যে তড়পাচ্ছে সেই ঝন্টু!

ঝন্টুকে নিয়ে মাথা ঘামাল না মনীশ। তার এখন ধ্যানজ্ঞান ওই লোকটা। ওই লোকটা তাকে সর্বস্বান্ত করেছে। তাকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা মনীশের কোনোদিনই নেই। থাকলে তার জীবনটা অন্যরকম হত। সে উঠোনে নেমে দুই লাফে গিয়ে পড়ল কচুবনে। হাতের উদ্যত লাঠিটা দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল দুটো লোককে লক্ষ করে।

লোকদুটো অপ্রস্তুত ছিল। বোধহয় ভাবেনি যে মনীশের মতো আহত বিছানায় শোয়া লোক এই কাণ্ড করতে পারে। একটা লোক মাথায় লাঠির চোট খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু অন্যটা দৌড়াতে লাগল। পিছনে মনীশ। যে পালাচ্ছে সেই যে চোর তাতে ভুল নেই। তার গলায় একটা গামছা মাফলারের মতো প্যাঁচানো। নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি। গায়ে কালো একটা সোয়েটার বা গেঞ্জী গোছের।

লোকটা দৌড়োয় পালাতে। মনীশ দৌড়োয় শোধ তুলতে। এমন দৌড় মনীশ জীবনে দৌড়োয়নি। কাল তার কাফ মাস্‌লে ব্যথা হবে। হয়তো ঝাঁকুনিতে শুকিয়ে আসা ক্ষত দুনিয়ে উঠবে। কিন্তু সে পরের কথা পরে। মনীশ শিকারী কুকুরের মতো ছুটতে লাগল।

চোর একটু বয়স্ক মানুষ। তার ওপর লুঙ্গিটাও তার পক্ষে মস্ত বাধা। ছুটে পালাতে হবে এমন কথা তো ছিল না।

পুরোনো শিবমন্দির বরাবর পৌঁছাতে পারলে লোকটা নিশ্চিন্ত। তারপরেই চারদিক চারটে রাস্তা। তার মধ্যে একটা সেঁধিয়েছে শ্যাওড়া জঙ্গলে। ওখানে বাঘ পর্যন্ত খুঁজে পায় না কাউকে।

কিন্তু অতদূর পৌঁছাতে পারা যায় না। তার আগেই মনীশ বিভীষণবেগে এসে পড়ছে। লোকটা অগত্যা চপার হাতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, মেরে দেবো শালা।

মনীশ আর সেই স্তরে নেই যে এই আওয়াজে ভয় খাবে। সে লাঠিটা আড়াআড়ি কোমরসমান চালিয়ে দিল। লোকটা চপার তুলেছিল। তার আগেই হাঁটুর কাছে লাগল লাঠিটা।

লোকটা অভিজ্ঞ, পাকা। চপারটাকে বল্লমের মতো ছুঁড়ে দিল মনীশের দিকে। মনীশ এক বিন্দুও সরল না। চপারটা কাঁধ বরাবর একটা ফালা দিয়ে বেরিয়ে গেল সাঁ করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত নামছে বুক ভিজিয়ে। কিন্তু কে রক্তের পরোয়া করছে? অনেক গেছে, না হয় আরও দু-চার লিটার যাবে।

মনীশ গামছাটা ধরে ফেলল। তারপর একটানে পেড়ে ফেলল লোকটাকে মাটির ওপর।

হরিহর মনীশের মতো আড়েদীঘে জোয়ান নয়। বয়সটাও তার বৈরী। তার ওপর হাঁফাচ্ছে। বুকে মনীশের হাঁটুর চাপ চেপে বসেছে লোহার মতো।

বল শালা, তুই কে?

ছেড়ে দাও, ভাল হবে না। এ গাঁয়েই কবর হয়ে যাবে।

সেটা একা আমার হবে না, তোরও হবে শুয়োরের বাচ্চা। বল তুই কে?

তোর বাপ। বলে চিত অবস্থাতেই পা তুলে এনে মনীশের গলায় পেঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল সে।

মনীশের টর্চটা এইসময় কাজে লাগল। পটাপট দুবার টর্চটা তুলে মুখের ওপর বসিয়ে দিল সে। কাচ ভাঙল, সেই সঙ্গে বোধহয় লোকটার নাকও। "বাপ রে" বলে কাতরাতে লাগল।

টর্চ ফেলে মনীশ দু'হাতে প্রায় পিস্টনের মতো ঘুষি মারতে লাগল লোকটাকে। অনুভব করল লোকটা নেতিয়ে পড়েছে।

গামছা ধরেই সে টেনে তুলল লোকটাকে।

চল শালা।

ঘুম-ভাঙা দু-চারটে লোক দরজা না খুলে জানালা বা ফোকর দিয়ে লক্ষ করছিল ঘটনাটা। বেরোয়নি। শুধু শাসন তার চাতালে হারিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে।

মহাশয়, একী?

এই সেই চোর শাসনবাবু?

হইতে পারে। কিন্তু মহাশয়, এই শরীরে আপনার কাণ্ড করা উচিত হয় নাই।

ঠিকই করেছি। এরা যদুর বাড়িতে হামলা করছে।

কিসের হামলা মহাশয়?

আমার সঙ্গে আসুন, দেখবেন।

কিন্তু ইহাকে লইয়া কী করিবেন? লোকটি এই গ্রামেরই বাসিন্দা। ইহার দলবল আছে।

আমি একে পুঁতব। যেখানে পুঁতব সেখানে গাছ হবে। সেই গাছের ছায়ায় বসলে আমার শরীর জুড়োবে।

শাসন মাথা নেড়ে বলল, ইহা অবিমৃশ্যকারিতা হইতেছে। আমি আগেই বলিয়াছি মহাশয়, আইন স্বহস্তে লইবেন না। তাহাতে বিপদ আছে।

মনীশ শাসনকে দেখিয়েই অর্ধ-অচেতন হরিহরকে একটা লাথি মেরে বলল, আমিই আইন। আমি একে পুঁতে ফেলব। তারপর মরলেও দুঃখ নেই।

শাসন আর কিছু বলল না। তবে সঙ্গে এল।

যদুর বাড়িতে তখন তুমুল চেঁচামেচি হচ্ছে। ঝন্টু আবিষ্কার করেছে তার এক সাকরেদ কচুবনে পড়ে আছে, অন্য জন হাওয়া।

কোন খানকীর ছেলে এ কাজ করেছে রে?....

দাওয়ায় কেউ নেই। মনুদের ঘর বন্ধ। ভিতর থেকে ভয়ার্ত মেয়ে গলার কান্নার আওয়াজ আসছে।

ঝন্টু উঠোনে দাঁড়িয়ে, তার পায়ের কাছে আহত সাকরেদ মাথায় হাত চেপে বসা।

হারিকেন হাতে আগে শাসন, পেছনে গামছায় বাঁধা হরিহরকে টানতে টানতে মনীশ উঠোনে ঢুকতেই ঝন্টু চুপ মেরে গেল। দৃশ্যটা তার স্বপ্নেরও অতীত। বাইরে থেকে আসা একটা ভেড়ুয়া লোক এই গাঁয়ের মেজো মস্তানকে এরকম হেনস্থা করতে পারে তা তার বিশ্বাসই হল না।

তবে সে একটা লাফ দিয়ে উঠল।

খানকীর—

বাকীটা শেষ হল না, মনীশ চাষার মতোই লাথি কষাল পেটে। একদম খুনিয়া লাথি। তলপেটে বসরে মরারই কথা।

শাসন হারিকেন রেখে শক্ত হাতে মনীশের কবজি চেপে ধরল, মহাশয়, খুনের দায়ে পড়িবেন যে।

তাতে আর আমার ভয় নেই। তিনটে খুনের জন্য একটাই তো ফাঁসী! আমি রাজি।

আপনি নিজেও আহত। স্কন্ধ হইতে অবিরাম রক্তপাত হইতেছে। এইসব নরপিশাচের সহিত পাল্লা দেওয়া বড় বিপজ্জনক।

আমি তো বিপদের জন্য রাজি।

দরজা খুলে মনু আর তার মা বেরিয়ে এল। পেছনে মন্টু আর পল্টু।

মনুই হরিণীর পায়ে নেমে এল, কী হয়েছে আপনার?

এই কথায় মনীশ দুনিয়া ভুলে গেল। তার আশেপাশে তিনটে লাশ, তবু মনুর সেদিকে দৃষ্টি নেই। সে মনীশের রক্ত সর্বাগ্রে দেখেছে।

মনীশ হরিহরকে ছেড়ে দিতেই লোকটা উঠোনে শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। মনীশ বলল, চোর ধরেছি।

মনু আতঙ্কিত চোখে মনীশের দিকে চেয়ে বলল, ভাল কাজ করেননি। শাসনবাবু, ওকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবেন একটু। ভোরের ট্রেনেই চলে যান আপনি।

কেন মনু?

এরা এবার আপনাকে মেরে ফেলবে। এদের আপনি চেনেন না।

মনীশ ক্লান্তস্বরে বলল, সে যা হয় হবে।

আপনি বারান্দার সিঁড়িতে বসুন। ওষুধ ব্যান্ডেজ সব আছে। আমি ড্রেস করে দিই। ইস, অনেকটা কেটেছে।

ঝন্টুকে কিন্তু আমিই মেরেছি।

বেশ করেছেন। ও মায়ের গায়েও হাত তুলেছিল।

অসুস্থ, রুগ্ণ, ফ্যাকাসে, দুর্বল কুসুম বারান্দায় মাথায় হাত দিয়ে উবু হয়ে বসে ক্ষীণ স্বরে কাঁদছে। পাড়ার দু-চারজন ভীরু পায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে চারদিকে। কথাবার্তার শব্দ বিশেষ নেই। ব্যাপারটা কী ঘটল- ভাল না মন্দ-তা আঁচ করার চেষ্টা করছে সবাই। হুট করে কিছু বললে কী কথার কী মানে দাঁড়াবে, কার পক্ষ নেওয়া হবে তা আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার। ব্যাপারটার মধ্যে পলিটিকস আছে কিনা তা-ই বা কে জানে!

মনু ঘর থেকে ওষুধ আর ব্যান্ডেজ এনে মনীশের পাশে বসে বলল, আমাদের বাড়ির মতো অশান্তি আর কোথাও নেই, জানেন! আমার একটুও ভাল লাগে না এখানে। শুধু মার মুখ চেয়ে থাকতে হয়।

না হলে কোথায় যেতে?

কী জানি! যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যেতাম। এবার বাবাকে চিঠি লিখব, কলকাতায় বাসা ভাড়া করে যেন আমাদের নিয়ে যায়।

শাসন আর মন্টু হরিহর আর ঝন্টুকে তুলে বসিয়েছে। দু'জনেই কাতরাচ্ছে। ঝন্টুর কাতরানির মধ্যেও ছিটেগুলির মতো "শুয়োরের বাচ্চা" "খানকীর ছেলে" ইত্যাদি শোনা যাচ্ছিল। হরিহরের কথা বলার মতো অবস্থা নয়।

রাগের চোটে মারটা কি একটু বেশী হয়ে গেছে? হোকগে। এরা যখন উল্টে তাকে মারবে তখন হিসেবটা করবে কে? হরিহর যখন তাকে মেরেছিল তখনই বা কে হিসেব করেছিল? তবে ঝন্টুকে মারাটা কতখানি যুক্তিযুক্ত হল সেটা বুঝতে পারছে না মনীশ। সে এদের নুন খেয়েছে, সেবাযত্ন নিয়েছে। সে অতিথি এবং আশ্রিত হয়ে এ বাড়ির ছেলেকে মেরে কি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল?

মনুর অভ্যেস নেই, তবু সাধ্যমতো ব্যান্ডেজ বাঁধল সে। মনীশ এত বেশী মানসিক উত্তেজনায় ছিল যে ড্রেসিং করার সময় কোনও ব্যথা টেরই পেল না।

মনু বলল, এবার উঠুন। হরিহরের দল খবর পেলেই এসে ধরবে আপনাকে। এতক্ষণে ধরারও কথা, তবে কোথাও ডাকাতি করতে গেছে বোধহয়। এইবেলা আপনি চলে যান।

মনীশ মাথা নাড়ল, না মনু, আমি আমার চুরি-যাওয়া জিনিস ফেরত চাই।

চুরির জিনিস কেউ কি কখনো ফেরত পায়? কবে বেচে দিয়েছে। জিনিস তো গেছেই, এখানে থাকলে প্রাণটাও যাবে।

শাসন কাছে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল, মহাশয়, কীরূপ বোধ করিতেছেন?

ভাল। আমার তেমন কিছু হয়নি।

তাহা হইলে আর সময় নষ্ট করিবেন না, মন্টু একটি সাইকেল জোগাড় করিয়া আনিবে। আপনি স্থানত্যাগ করুন।

চোরদের ব্যবস্থা কী হবে?

শাসন মাথা নেড়ে বলল, ব্যবস্থা কিছুই হইবে না। এই সকল স্থানে ব্যবস্থা বড় একটা হয়ও না। এই সকল লইয়া মনে মনে বিব্রত হইবেন না। আপনি যে বীরত্বের কাজ করিয়াছেন তাহা লোকে ভাল চক্ষে দেখিবে না। ইহারা বহিরাগতের স্পর্ধা সহ্য করিতে পারে না।

তাহলে আমি যে মার খেলাম, আমার সর্বস্ব চুরি গেল তার কোনও বিহিত হবে না? চোরকে ধরেছি বলে সেই অপরাধে পালাতে হবে?

মহাশয়, ভাবিয়া দেখিলে আপনিও তো তস্করই। কে কাহার দণ্ডবিধান করিবে? যাহারা চোরকে ধরিবে সেই পুলিশও হরেদরে কাশ্যপ গোত্র।

মনু পাশেই বসে ছিল। খুব নরম গলায় বলল, কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থাকলে এরা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মনীশ একটু চুপ করে রইল। তার মাথাও ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল হঠাৎ রাগের মাথায় যে কাজটা করে বসেছে সে কাজটা সত্যিই বিপজ্জনক। গাঁ-গঞ্জে ঘুরে তার অভিজ্ঞতা তো কম হয়নি। সুতরাং মনু আর শাসন যে-পরামর্শ দিচ্ছে তা উপেক্ষা করার মতো নয়।

মনীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই হবে।

মনু মৃদুস্বরে বলল, আমি কথা দিচ্ছি, পড়ব। নিজে নিজে পড়ব। বটকেষ্টর কথা একবারও ভাববো না।

মনীশ একথায় এত দুঃখেও হেসে ফেলল, তাহলে কার কথা ভাববে?

মনু অকপটে বলল, আপনার কথা।

।। দশ ।।

কলকাতার ডাক্তাররা যখন ক্যানসার বলে সন্দেহ করেছিল তখন কল্পনাকে সোজা বোম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক। যদি সেখানে ডাক্তাররা ভিন্ন মত দেন। যশলোক হাসপাতালের ডাক্তাররা ভিন্ন মত দেননি। মৃগাঙ্ক যখন কল্পনাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনছেন তখন প্লেনে কল্পনা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমার সত্যিকারের কী হয়েছে বলে তো। ডাক্তাররা কী বলছে? ক্যানসার?

আরে না। সন্দেহ একটু হয়েছিল। এরা তো বলল ওসব নয়। টিউমারিক একটা গ্রোথ।

কল্পনা সারা রাস্তা আর কথা প্রায় বলেইনি। কলকাতায় এসে বাড়িতে কয়েকদিন কাটানোর পর নিতান্ত নার্সিং এবং চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখার জন্য কল্পনাকে নার্সিং হোম-এ পাঠানোই ঠিক করেছিলেন মৃগাঙ্ক।

নার্সিং হোম-এ যাওয়ার সময় কল্পনা তাঁকে অনেক কথা বলেছিল। ঘর-সংসারে নানা টুকিটাকি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি। মৃগাঙ্কর তখন সেসব কথায় মন দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে কী শুনেছিলেন তা খেয়ালই নেই। কিন্তু হঠাৎ দিল্লী যাওয়ার প্লেনে তাঁর মনে পড়ে গেল, কল্পনা একটা বিস্কুটের টিনের কথা বলেছিল। টিনটা আলমারিতে আছে। বলেছিল, কিছু টাকা আছে। বেশ কিছু টাকা। আমার ভালমন্দ কিছু হলে ওটা নিও।

দিল্লীর পাঁচতারা হোটেলের ঘরে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে রাতে মৃগাঙ্ক অলকাকে বললেন, আমি ইনহিউম্যান নই অলকা। টাকাটা তোমাকে দেবো।

সেই পেস মেকারের টাকা?

হ্যাঁ।

অলকা মৃদু একটু শব্দ করে হাসল, জানি তো।

তোমার স্বামীকে আমি হিংসে করি না।

কেন করবেন বলুন। সে লোকটার বয়স আপনার চেয়ে অনেক কম, তবু যেন সাত বুড়োর এক বুড়ো। না আছে টাকা, না আর কিছু। তাকে হিংসে করার কী আপনার? আপনার সঙ্গে তো ওর তুলনাই হয় না।

মৃগাঙ্ক বয়সের কথায় একটু ক্ষুব্ধ হলেন, তোমার স্বামীর বয়স কত?

কত আর হবে। পঁয়তাল্লিশ। আমার চেয়ে কুড়ি বছর বয়সে বড়।

বয়সের কথাটা থাক।

বুদ্ধিমতী অলকা বুঝল, বয়সের ইঙ্গিত করে সে ভুল করেছে। মিষ্টি একটু শব্দ করে হাই তুলে বলল, পুরুষ মানুষের আবার বয়স কী বলুন। মেয়েরা তো কুড়িতে বুড়ি। পুরুষরা আশিতেও যুবক।

বলছো?

বলব না? সত্যি কথা বল না কেন বলুন। আচ্ছা, কুতুবমিনার কত উঁচু? আমাদের মনুমেন্টের চেয়েও?

প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরে গেল।

কিন্তু দিল্লীতে যে কটা দিন রইলেন মৃগাঙ্ক, প্রতিদিন বিস্কুটের টিনের কথা মনে পড়ত। কল্পনা টাকার অঙ্কটাও বলেছিল। সঠিক মনে নেই, তবে বোধহয় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা।

তাজমহল দেখে ফতেপুর সিক্রি যাওয়ার পথে অ্যাম্বাসাডারের পিছনের সীটে পাশে বসা অলকার হাত নিয়ে খেলা করতে করতে মৃগাঙ্ক বললেন, শোনো অলকা সুমিত অ্যামেরিকা চলে যাবে।

তাই বুঝি?

ও চলে গেলে অত বড় বাড়ি আগলে থাকার কোনো মানেই হয় না।

ঠিকই তো।

আমি একটা ফ্ল্যাট কিনছি। থাকবে আমার সঙ্গে?

অলকা এক সেকেন্ডও সময় না নিয়ে বলল, রাখবেন? সত্যিই?

তাই তো বলছি।

কিন্তু ও যদি তখনও বেঁচে থাকে? যদি বাগড়া দেয়?

ডিভোর্স বলে একটা কথা আছে, জানো?

ও বাবা, জানি না আবার!

ডিভোর্স করবে।

অলকা মৃগাঙ্কর কাঁধে মাথা রেখে বলল, তাই হবে। আপনি যা চাইবেন তাই হবে।

আর যদুটাকে গিয়েই তাড়াবো।

আমি থাকলে আপনার কাজের লোক রাখার দরকারই হবে না। শুধু ঠিকে ঝি হলেই হবে।

তা কেন? কাজের লোকও থাকবে। তবে অন্য লোক।

খুব ভাল হবে।

মৃগাঙ্ক খানিকক্ষণ প্রগাঢ় চিন্তা করে হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, ছেলেরা জানতে পারলে আপত্তি করবে জানি। কিন্তু ওরা তো আর জানে না বেশী বয়সের একাকীত্ব কী জিনিস!

ছেলেদের কথা ভাবছেন কেন? তারা তো আর কাছে থাকবে না।

থাকবে না। তবে মাঝে মাঝে যখন দেশে ফিরবে তখন হয়তো দেখা করবে না, সঙ্গে থাকতে চাইবে না। মেয়েও হয়তো বাপের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেবে।

বুড়ো বাপের জন্য তারাও তো কিছু করছে না।

বুড়ো কথাটা ফের মুখ ফস্কে বেরিয়ে জিব কাটল অলকা। বেরিয়ে গেছে, আর ফেরাবার উপায় নেই। তাই কথার জের টেনে বলল, আপনার দিকটাও তো তারা দেখতে আসছে না। আপনি কী খেলেন, কী পরলেন, কেমন করে সময় কাটছে এসবও তো সন্তানের দেখা দরকার।

সে তো ঠিকই।

তাহলে ভাবছেন কেন? আপনাকেও তো কাউকে অবলম্বন করে বাঁচতে হবে। ওদের জন্য যা করার সবই করেছেন। এখন আবার ওদের কথা ভেবেই যদি নিজেকে শুকিয়ে মারেন সেটা তো ভাল নয়।

মৃগাঙ্ক জানেন, দোটানার ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে হবে। বাড়িতেই হোক বা ফ্ল্যাটেই হোক, সম্পূর্ণ একা হয়ে বাকী জীবনটা কাটানো অসম্ভব। সম্ভবত তিনি বেশ কিছুদিন বাঁচবেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনও চমৎকার। রোজই কিছুক্ষণ ব্যায়াম আর আসন করেন। তাঁর খাওয়া খুব কম। মিষ্টি ছোঁন না, চায়ে চিনি পর্যন্ত নয়। মদ্যপান পরিমিত। সিগারেট ছেড়েছেন দশ বছর আগে। রক্তচাপ, ব্লাডসুগার, কোলেস্টারাল ইত্যাদিতে কোনও ঝামেলা এখনও নেই। বেঁচে থাকাটা

এখনও তাঁর কাছে দারুণ উপভোগ্য। সেই বেঁচে থাকাটাকে আলুনী করে দেবেন কেন?

দিল্লী থেকে ফেরার পথেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। সুমিত চলে যাওয়ার পর তিনি আলাদা ফ্ল্যাটে অলকাকে নিয়ে থাকবেন।

মর্নিং ফ্লাইটটা লেট ছিল। একটু বেলায় বাড়িতে ফিরে দেখলেন, যদু নেই। তার বদলে বিশু রান্না করে বসে আছে।

যদুর নামটা উচ্চারণ করতেও আজ গলায় ঝাঁঝ এল মৃগাঙ্কবাবুর, যদু কোথায়?

বিশু সভয়ে বলল, তার দেশের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে খবর পেয়ে দেশে গেছে।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে বললেন, ডাকাতি! ওর বাড়িতে ডাকাতি হবে কি করে? ওরা তো ভাল করে খেতেও পায় না।

ওর ছেলে পল্টু এসে তো তাই বলল। যদুদাও খবর পেয়ে তক্ষুনি চলে গেল। আমাকে বলে গেল, ঘরবাড়ি আর রান্নাবান্না একটু দেখিস।

বিস্কুটের টিনটার কথা মৃগাঙ্কর মনে রইল না। দুপুরে বিশ্রাম করলেন, বিকেলে গেলেন দীনেশের বাড়িতে।

দীনেশ আজ যথেষ্ট হাসিখুশি। মেজাজ খুব শরীফ। ওপরের বসবার ঘরে পাশের কৌচে একটি তরুণী বসে। মৃগাঙ্ক লক্ষ্য করলেন, মেয়েটি শুধু সুন্দরীই নয়, মুখে বুদ্ধিমত্তা, লেখাপড়া এবং আভিজাত্যেরও ছাপ আছে। মেয়ে খুঁজে বের করার প্রতিভায় দীনেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মিট সোমলতা দাশগুপ্ত।

মৃগাঙ্ক প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

সোমলতা ভারী মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনার কথাই এতক্ষণে হচ্ছিল।

মৃগাঙ্ক বুকের মধ্যে একটা ঢেউ ভাঙার শব্দ পেলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, কী কথা? এনিথিং ফ্ল্যাটারিং?

একজ্যাক্টলি।

একথা ঠিক, সোমলতা ভারী শিক্ষিতা। এম এ পাশ। সত্যিকারেরই একটা চাকরি করে। আর এটা অর্থাৎ এই মেলামেশাটা - তার হবি।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভিতরে একটু কিন্তু আছে। সে থাকবেই। কারণ যারা এরকম জীবনে অভ্যস্ত মিথ্যেকথাটা তাদের প্রথমেই রপ্ত করে নিতে হয়। সকলেই অলকার মতো বোকা নয়। সোমলতা অলকার চেয়ে দশগুণ বুদ্ধিমতী। এর মিথ্যে ধরতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

দীনেশ একটু চোখের ইশারায় কাছে ডেকে কানে কানে বলল, আজ তোর দিন। শী ইজ ফ্যানটাস্টিক। তোর অলকার নেশা ছুটিয়ে দেবে।

কে জানে কেন মৃগাঙ্কর আপত্তি হল না। কিন্তু নিজের বিশ্বস্ততার অভাবে নিজেই মনে মনে একটু লজ্জিত হলেন। যখন একা ঘরে সোমলতার সঙ্গে তাঁর নিরাবরণ ঘনিষ্ঠতা হচ্ছিল তখন তিনি ভাবছিলেন, অলকা জানতে পারলে ভারী লজ্জার ব্যাপার হবে। কখন যে অলকা কল্পনার জায়গাটা দখল করেছে কে জানে!

দীনেশ মিথ্যে বলেনি। অনেকদিন বাদে মৃগাঙ্ক যেন স্রোতের জলে ডুব দিয়ে উঠলেন।

পাঁচশো টাকার একখানা বেয়ারার চেক অত্যন্ত স্মার্টভাবে নিয়ে সোমলতা চলে গেল। তার এনগেজমেন্ট আছে।

দুই বন্ধু মুখোমুখি বসলেন। দীনেশ হেসে বলে, তোর মুখচোখ যে ঝলমল করছে।

মৃগাঙ্ক একটু হাসলেন।

কেন যে অলকার পেছনে লেগে আছিস। কিছু থোক টাকা দিয়ে ওটাকে এখন বিদেয় কর। মেয়েমানুষ কখনো ঘাড়ে নিতে নেই। হাজারো কমপ্লিকেশন দেখা দেয়। এরকম আলগা সম্পর্ক রাখলে লোকে বদনাম করে বটে, কিন্তু তেমন দোষ ধরে না। কিন্তু যদি ঘরে নিয়ে তুলিস তবে তোর ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু সবাই তোকে একঘরে করবে।

মৃগাঙ্ক মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে দোটানায় পড়লেন। নিজেকে তিনি চেনেন। তাঁর সেন্টিমেন্ট প্রবল। অলকার প্রতি তাঁর দুর্বলতাও অস্বীকার করার নয়। কিন্তু সোমলতা তাঁর

মাথাটা আজ ঘুরিয়ে দিয়েছে। দীনেশ হয়তো ঠিকই বলে। বাঁধা পড়ার অনেক ফ্যাসাদ। তাঁকে ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখতে হবে। তবে একাকিত্বকে তিনি বড় ভয় পান।

দীনেশ নিমীলিত নয়নে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে বলল, একটা ব্যাপারে তোকে একটু খোঁজ নিতে বলছি। যদু এত টাকা কোথায় পাচ্ছে?

কিসের টাকা?

এর আগে ও দু-হাজার টাকা পাঠিয়েছিল বাড়িতে। সে কথা তোকে বলেওছি। আবার শুনছি, ক'দিন আগে সোনার দুল, রুলি, আংটি, শাড়ি আরও সব কী কী কিনে নিয়ে গিয়েছিল দেশে। একটা জমি বায়না করে এসেছে।

মৃগাঙ্গ অবাক হয়ে বলেন, তাই নাকি? সেই জন্যই কি ডাকাত পড়েছিল বাড়িতে?

ডাকাত-ফাকাত নয়। ওর বড় ছেলে ঝন্টু খুব গুণধর। শুনলুম, বাড়ি থেকে চুরি করে পালিয়ে এখন চোর-ডাকাতদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। সে-ই দল পাকিয়ে এসেছিল নিজের মা-বোনের গয়নাগাঁটি আর টাকা-পয়সা কেড়ে নিতে।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে বললেন, নিজের বাড়িতে?

অবাক হচ্ছিস কেন? এরকম আকছার হয়। তবে ঝন্টু কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাইপো মনীশ সে সময়ে ও বাড়িতে ছিল। সে ধরে তিনটে লোককে খুব ঠেঙিয়েছে। বাহাদুর ছেলে। তার কাছেই সব বৃত্তান্ত শুনলুম। কথা হল, যদু টাকা পাচ্ছে কোথায়!

আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।

দীনেশ হাসে, যতদিন বউঠান ছিল ততদিন ভাববার দরকার ছিল না। এখন তোকেই ভাবতে হবে। আমার ধারণা ও চুরিটুরি শুরু করেছে।

দশ বছর ধরে আছে, কল্পনা তো কখনও ওকে সন্দেহ করেনি।

দীনেশ মাথা নেড়ে বলল, ওটা কোনও কথা নয়। ভাল করে খোঁজ নে। বাড়িতে গয়না-টয়না কিছু থাকত?

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, জানি না। কল্পনার গায়ে বেশী গয়না থাকত না। খুব বেশী হলে একটা হার, দুগাছা করে চুরি। সেগুলো বোধহয় সুমিতের কাছে আছে। বাকী গয়না লকারে। তবে কল্পনার কিছু টাকা ছিল। আলমারিতে।

দীনেশ নিমীলিত চোখে চেয়ে থেকেই হঠাৎ বলে, সাবধানে থাকিস।

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, ঘরে আর তেমন কিছু থাকে না বোধহয়।

দীনেশ ফের বলল, জিনিসপত্র বড় কথা নয়, তুই নিজেও সাবধানে থাকিস।

হঠাৎ সাবধান করছিস কেন?

দীনেশ একটু হাসল, কালোবাবার ফোরকাস্ট যদি ফের মিলে যায়?

কালোবাবার ফোরকাস্ট! সে আবার কী?

এখন বলা যাবে না।

মৃগাঙ্ক দীনেশের দিকে একটু হাঁ করে এগিয়ে থেকে বললেন, কল্পনা যেদিন মারা যায় সেদিনও তুই এরকম কী একটা বলেছিলি! সেটা মিলে গিয়েছিল। কী ব্যাপার বল তো!

দীনেশ চট করে জবাব দিল না। বোতল খুলে খুব মেপে দুটো গেলাসে ঢালল। জল আর সোডা মেশাল। এক কুচি করে বরফ। একটা গেলাসে মৃগাঙ্কর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, লোকটার ভিতরে জিনিস আছে।

মৃগাঙ্ক বিরক্ত মুখে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বললেন, তুই দিন দিন কি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছিস?

দীনেশ বলে, না। জীবনের নানা রহস্য একটু একটু ভেদ করার চেষ্টা করছি। পৃথিবীর সব ঘটনাই তো ঘটে আছে। প্রাঞ্জল চোখ থাকলে তা দেখাও যায়।

কী ঘটনা ঘটে আছে বলবি তো!

বলে লাভ নেই। যা ঘটবার তা ঘটবেই। ঘটে কিনা সেটাই দেখবার।

মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লেন, বললো, তোর বয়স একদম বাড়ছে না।

বয়স বাড়িয়ে বুড়োটে মারব নাকি? ওসব আমার ধাতে নেই।

বুড়ো না হলেও সাবালক হতে দোষ কী?

দীনেশ মৃদু হেসে বললেন, আর তুই যে এখনও বয়ঃসন্ধিই পেরোতে পারছিস না। সোমলতাকে দেখে তোর মুখখানা যা রাঙা হল সেরকম ষোলো বছর বয়সে হয়।

মৃগাঙ্ক হুইস্কিটা শেষ করলেন। আজকাল এক-দু পেগের বেশী কখনোই খান না। তবে আজ একটু তাড়াতাড়ি খেলেন। মনটা কেমন উচাটন। ফলে শরীরেও অশান্তি হচ্ছে। মৃগাঙ্ক দীনেশের দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে কালোবাবা ইজ প্লেয়িং হিজ ট্রিকস্ এগেন? ওর সঙ্গে একটু দেখা করব।

এই বলে উঠলেন।

কালোবাবা ঘরেই বসেছিলেন। ইদানীং বাইরের লোক আসা বন্ধ রয়েছে। কালোবাবার মুখখানা বিষণ্ন, চোখ যেন একটু বসাও।

মৃগাঙ্ক দূর থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আজ একটা প্রণাম করে বললেন, কেমন আছেন?

আপনি ব্রাহ্মণ, আমাকে প্রণাম করেন কেন?

ইচ্ছে হল বলে। এখন বলুন তো আমার কিসের বিপদ!

কালোবাবা সচকিত হয়ে মৃগাঙ্কর দিকে তাকালেন। পরমুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিলেন। মুখটা যেন বিষণ্ণতায় ঢেকে গেল। মৃদু স্বরে বললেন, কে বলল? দীনেশবাবা নাকি?

মৃগাঙ্ক বলেন, হ্যাঁ। এর আগেও আপনি নাকি আমার স্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে ফোরকাস্ট করেছিলেন। সেটা মিলে গিয়েছিল।

ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ওসব কানে নেবেন না। দীনেশবাবা জোর করে আমার পেট থেকে কথা বের করে নেন, তারপর সেটা পাঁচজনকে বলে বেড়ান। কাজটা উনি ভাল করেন না।

কিন্তু আমার কিসের বিপদ?

আমি জানি না বাবা।

আপনি সত্যিই কি দীনেশকে কিছু বলেননি?

বললুম তো, দীনেশবাবা আমার পেট থেকে কথা টেনে বার করে নেন। আমি আর এসব পেরে উঠছি না। উনি কেবল ম্যাজিক দেখতে চান, অশৈলী কাণ্ড দেখতে চান, ভূত আত্মা এসব দেখতে চান।

দীনেশ আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছে।

সাবধান হওয়া ভাল। সাবধানের মার নেই।

কিরকম সাবধান হব?

সবদিক দিয়ে।

আমার প্রাণের ভয় আছে কি?

কালোবাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কার নেই। ফুটুস করে কবে কে মরে যাবো তার কি ঠিক আছে কিছু?

তার মানে কি, আপনি আমাকে বলবেন না?

শুনে কিছু লাভ হবে না। তবে চারদিক দিয়ে সাবধান হওয়া ভাল। আজ যে বড় অলকা-মাকে দেখছি না।

তাকে দীনেশ একরকম ছাড়িয়ে দিয়েছে।

কালোবাবা মাথা নেড়ে বলেন, দেওয়ারই কথা। নতুন একটি এসেছেন দেখেছি।

হ্যাঁ।

কালোবাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দীনেশবাবার বড্ড খিদে।

মৃগাঙ্কর একবার বলতে ইচ্ছে হল, আমারও। কিন্তু ভদ্রতাবশে বললেন না। তিনি দীনেশের মতো বন্য স্বভাবের নন। স্যাডিস্টও নন। তিনি চুপ করে রইলেন।

কালোবাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চলে যেতে চেয়েছিলুম বলে দীনেশবাবা পায়ে ধরে মেলা কান্নাকাটি করলেন। যেতে পারলুম না। তবে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে।

কী বন্দোবস্ত?

দীনেশবাবার দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকব। নামধ্যান করব। বেশ হবে।

শুধু নামধ্যান করলেই সব হয়?

আমার তো আর কিছু চাই না। একটা কোন পেলেই হল।

মৃগাঙ্কর সন্ধেটা ভাল কাটছিল। শেষটায় একটু বিগড়ে গেলেন। প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, আপনার সঙ্গে আমাদের লাইনটা মিলবে না। তবে মনে হয়, আপনার মতো হতে পারলে বেশ হত।

বাড়িতে ফিরে মৃগাঙ্ক দেখলেন, যদু এসেছে। মুখখানা হাঁড়ির মতো। কি রে, তোর বাড়িতে কী হয়েছিল?

আজ্ঞে ও কিছু নয়। পারিবারিক ব্যাপার।

মৃগাঙ্ক কিছুটা জানেন। তাই আর ঘাঁটালেন না। সুমিত ফেরেনি এখনও। কল্পনা মারা যাওয়ার পর থেকে সে আবার রাত করে বাড়ি ফেরে। একটি যুবক ছেলে কেনই বা সাঁঝ সন্ধেবেলা বাড়ি এসে থাকবে?

মৃগাঙ্ক বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে শোওয়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে আলমারি খুললেন। বিস্কুটের টিন যথাস্থানে আছে। তবে তাতে টাকা নেই। একেবারে ফাঁকা।

মৃগাঙ্কের মাথাটা ঝাঁ করে ঘুরে গেল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। আলমারিটা তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। টাকা কোথাও নেই।

তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ল, কল্পনা তাঁকে বলেছিল, আলমারিতে বিস্কুটের টিনের মধ্যে তার বেশ কিছু টাকা আছে।

তাহলে? তাহলে কি যদু? দীনেশ বলেছিল।

যদু!

যদু এসে নিঃশব্দে সামনে দাঁড়াল।

মৃগাঙ্কর প্রথমে একটু দ্বিধা এল। দশ বছর ধরে আছে, ও কি চুরি করবে? কিন্তু পরিস্থিতি পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মৃগাঙ্কর বুকটা বেশ কেঁপে উঠল। প্রথমটায় নরম গলায় বললেন, আলমারিতে তোর মায়ের কিছু টাকা ছিল। জানিস?

আজ্ঞে না। গলাটা বেশ একটু রুক্ষ।

কোথায় গেল তাহলে?

আমি তো জানি না।

কে জানবে তাহলে?

আমি বলতে পারব না।

মৃগাঙ্কর রক্ত ধীরে ধীরে গরম হচ্ছিল। বললেন, টাকার খবর তুই জানতি না?

না। কি করে জানব?

যদু, যদি নিয়ে থাকিস দিয়ে দে। নইলে ভাল হবে না।

আমি কেন নেবো? কী সব বলছেন!

দেশের বাড়িতে কিছুদিন আগে তুই দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছিলি? তারপর আবার গয়না-টয়না, শাড়ি এসবও কিনে পাঠিয়েছিস?

না তো। কে বললো?

খবর সবাই জানে।

যদু প্রায় সমান তেজে বলল, যে বলেছে সে মিথ্যে কথা বলেছে।

মৃগাঙ্ক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এতখানি স্পর্ধা তিনি যদুর কাছ থেকে আশা করেন না। ওর গলার স্বর রীতিমত ঝাঁঝাল। মৃগাঙ্ক কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে রাগে পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে বললেন, তাহলে তুই স্বীকার করবি না?

যদুর গলায় তেজ থাকলেও মুখের রং ফ্যাকাসে। চোখে ভয়ার্ত এক দৃষ্টি। সে মাথা নেড়ে বলল, স্বীকার করব কেন? ওসব বাজে কথা। কেউ বানিয়ে বলেছে।

মৃগাঙ্ক শূন্য বিস্কুটের টিনটা সশব্দে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা গিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করতে

লাগলেন।

মৃগাঙ্ক কোথায় ডায়াল করছেন তা যদু জানে। উনি থানায় ফোন করছেন। মৃগাঙ্ককে থানার বড়বাবু ভালই চেনেন। ফোন পেয়েই পুলিশ চলে আসছে। তদন্তও হবে। যদু ধরা পড়ে যাবে। বড্ড বোকার মতো সব কাজ করে রেখেছে সে। ধরা পড়ারই কথা। যদুর ভিতরটা রাগে মসমস করছে। প্রথম রাগ অলকার জন্য। অলকাকে মৃগাঙ্কবাবু দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল। ঝড়ুয়া মিস্ত্রি এসে নিজেই খবর শুনিয়ে গেছে যদুকে। বলেছে, বাবুরা আর বাবু নেই রে, সব ছোটোলোক হয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাগ, এত সাধের টাকা তার, তাও দু'হাজার চুরি করে পালাল ঝন্টু। তারপর বাড়ির ছেলে হয়ে সে-বাড়িতেই এসে চড়াও হল। তৃতীয় রাগ, এত করেও সামলাতে পারল না যদু। হিসেবের বাইরের টাকা, তবু বোকার মতো ধরা পড়ে গেল।

মৃগাঙ্কবাবুর ডায়াল শেষ হয়ে এল। যদু চট করে রান্নাঘরে ঢুকে তাক থেকে ভারী হাতুড়িটা তুলে নিল। সে ঘানি টানতে পারবে না। এই টাকা সে এখন ভোগ করবে। একটা চরিত্রহীন লম্পট মদ্যপ তাকে টেক্কা দিয়ে যাবে তা হবে না।

মৃগাঙ্ক কিছুই টের পেলেন না। পিছন ফিরে ছিলেন। তার ওপর উত্তেজিত, বিভ্রান্ত।

যদু সপাটে হাতুড়িটা বসাল মৃগাঙ্কের মাথার পিছন দিকটায়। একবারই। একটা বীভৎস শব্দ হল।

প্রথমে রিসিভারটা পড়ল। মৃগাঙ্ক একবার হাঁ করলেন। তারপর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনে। তিনি দ হলেন, তারপর মেঝের ওপর পড়লেন ভাঁজ হয়ে।

যদু হাতুড়িটা একটু ধুয়ে জায়গামতো রেখে দিল। দরজা খুলে নিচে নেমে নিজের ঘরে ঢুকল। সুটকেসটা চটপট গুছিয়ে নিয়ে বালিশটা বগলে চেপে সদর খুলে বেরোলো।

বিশু হাঁ হয়ে গেল তাকে দেখে, এ কী? কোথায় চললে?

চাকরিটা গেল।

কখন?

এক্ষুনি।

বিশু ব্যস্ত হয়ে বলল, হঠাৎ হল কী বলো তো।

অত কথা বলার মতো সময় নেই। গাড়ি ধরতে হবে।

যদু রাস্তায় পড়েই একটা ট্যাক্সি ধরে ফেলল। আর ট্যাক্সিতে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ সমস্ত ঘটনাটার ধাক্কা তার মাথায় এসে লাগল। এ কী করল? সে দশ বছরের অন্নদাতাকে সে মেরে ফেলল, এত অনায়াসে? একটা মেয়েমানুষ আর কিছু টাকার জন্য? তার যে ফাঁসি হবে। পুলিশের তাড়া খেয়ে কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হবে।

যদু সুটকেস থেকে ব্রান্ডির শিশিটা বের করে গলায় ঢেলে দিল। ট্যাক্সিওয়ালা একবার ফিরে দেখল তাকে। কিছু বলল না।

যদুর বুক জ্বলে যেতে লাগল। মাথাটা ঘুরছে। সে একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ করল। শরীরটা কেমন যেন ভয়ংকর কাঁপছে। বমি পাচ্ছে।

স্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে করতে যদু বারবার পিছু ফিরে দেখছিল? পুলিশ কি এত তাড়াতাড়ি খবর পেয়েছে? বিশু কিছু সন্দেহ করেনি তো?

গাড়ি এল। ভীড়ের গাড়ি। যদু উঠে পড়ল ঠেলেঠুলে। তারপর ঠাসা ভীড়ের মধ্যেই এক জায়গায় মেঝের ওপর বসে পড়ল। রক্ষা। কেউ তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে মানুষের পা। যদু শ্বাসরোধকারী ঘুপচির মধ্যে বসে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগল।

এক অন্ধকার জোনাকি-জ্বলা পথে হাঁটছিল যদু। অনেকদিন যাতায়াতের অভাবে রাস্তাঘাটের স্বভাবচরিত্র ভুল হয়ে গেছে। বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। আগে পিছে আরও-দু-চারজন লোক যাচ্ছে। যদু কাউকে দেখছে না। সে রয়েছে একটা ঘোরের মধ্যে। যেন খুব জ্বর হয়েছে তার। হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব কথা আসছে মাথায়। গ্যাসের উনুনে দুধ বসানো ছিল। এতক্ষণে দুধটা পুড়ে ঝামা হয়ে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটি গলে গেছে নিশ্চয়ই। মৃগাঙ্কবাবুর রক্তে কার্পেটটি ভিজে গিয়েছিল, পরিষ্কার করতে বেশ ঝামেলা হবে। সুমিত রোজ ফিরে এসে রাত্রে এক কাপ চা খায়। আজ বোধহয় খাবে না।

দুচোখে কেন অজস্র জলের ধারা ঝরে পড়ছিল যদুর তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। একবার সে থেমে দাঁড়াল। নাঃ, ফিরে যাবে। তারপর যা হয় হোক। গ্যাস জ্বলে যাচ্ছে... বাবা রক্তমাখা মাথা নিয়ে পড়ে আছে... হয়তো কলিং বেল বেজে যাচ্ছে.....

যদুর মাথাটা বড় গোলমাল করছে। ..হাতুড়িটা কেন যে হাতের কাছে রেখেছিল কে জানে। ওইটাই যত নষ্টের মূল।

কিন্তু হঠাৎ যদুর খেয়াল হল, সে যাচ্ছে কোথায়? দেশের বাড়ি? সেখানে তো রাত না পোহাতেই পুলিশ আসবে। খুনের মামলা। সহজে তো ছাড়া পাবে না সে। খুঁজে খুঁজে পুলিশ তাকে বের করবেই।

অকারণেই যদু বারবার পিছু ফিরে চাইছিল। টাকাটাই শালা অপয়া। এটা যেদিন চুরি করল সেদিন থেকেই যদুর সব কাজে ভুলভাল হচ্ছে। চুরির সঙ্গে সঙ্গে যেন ধরা পড়ার ফাঁদও পেতে রাখল সে। পল্টুর হাত দিয়ে সেই যে দু-হাজার টাকা পাঠাল সেটা রা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। রহিমের জমিটাও এ সময়ে বায়না করা ঠিক হয়নি। ওটাই তার পয়লা নম্বর গণ্ডগোল।

গাঁয়ে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল যদুর। শীতেও হাঁটার চোটে তার ঘাম হচ্ছে। শ্বাস বইছে ঝড়ের মতো। শরীরটা জুত লাগছে না। নিজের বাড়ির কাছ বরাবর এসে একটু দাঁড়াল যদু। ঘরে আলো জ্বলছে। জেগে আছে সবাই। কিন্তু ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভারী সঙ্কোচ হল তার। কাল সবাই জেনে যাবে সে চোর, খুনে। সবচেয়ে বেশী লজ্জা তার মেয়ে মনুকে। বড় ভাল মেয়েটা। চোরের সন্তান হওয়ার কথা নয় তার।

যদু ফিরল।

রাস্তায় লোকজন নেই। অন্ধকার। যদুর তাতে সুবিধে। কেউ না দেখলেই ভাল।

শাসনের দরজায় গিয়ে যদু যখন কড়া নাড়ল তখন সে বড় হাফসে গেছে।

শাসন লণ্ঠন হাতে দরজা খুলে একটু অবাক হয়ে বলে, যদুবাবু যে? অকস্মাৎ কী সংবাদ? ভিতরে আসুন।

যদুর হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। দরদালানে ঢুকে বালিশ আর স্যুটকেস রেখে সে উবু হয়ে বসে কিছুক্ষণ হাঁফ ছাড়ল। তারপর বলল, আমাকে কি বাঁচাতে পারবেন শাসনদাদা?

আপনাকে বড় উদ্‌ভ্রান্ত দেখিতেছি। অগ্রে বিশ্রাম করুন। বাড়ির সকল সংবাদ শুভ তো?

যদু ক্ষীণ স্বরে বলল, বাড়ি যাইনি। যাওয়ার উপায় নেই।

শাসন প্রশ্ন করল না। এক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে বলল, কিছু আহার করিবেন কি?

যদু মাথা নেড়ে বলে, পেটে কিছু সেঁধোবে না। আমি বড় পাপী... এই বলে যদু দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ কাঁদল। সব ভুলে শুধু কেঁদে গেল নিজেকে ভাসিয়ে।

শাসন ততক্ষণ অপেক্ষা করল। একটিও প্রশ্ন করল না।

অনেকক্ষণ কাঁদার পর যদুর মাথা ব্যথা করতে শুরু করল, হেঁচকি উঠছে, চোখ লাল।

শাসন তাকে কূট চোখে লক্ষ করছিল। বলল, আজ আর কিছু বলিবার দরকার নাই। আজ আপনি নিদ্রা যান। কাল সকালে সকল খুলিয়া বলিবেন।

যদু অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকার পর বলল, আর বোধহয় সকাল হবে না শাসনদাদা।

জলটুকু পান করুন।

যদু আলগোছে জলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল। তার যে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল তাও সে এতক্ষণে খেয়াল করেনি। জলটা খাওয়ার পর সেটা বুঝল। গেলাসটা রেখে সে বলল, আমি একটু স্নান করব শাসনদাদা।

স্নান! এই শীতের রাত্রিতে?

যদু উঠে পড়ে বলল, স্নান করতেই হবে শাসনদাদা। নইলে মরে যাবো।

শাসন দড়ি থেকে গামছাটা আর দড়ি সমেত কুয়োর বালতি এগিয়ে দিয়ে বলল, যেমন আপনার ইচ্ছা।

যদু খোলা কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে বালতি বালতি জল ঢেলে স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আধভেজা গায়ে জড়োসড়ো হয়ে দরদালানে এসে স্যুটকেস খুলে কাপড় বদলাল।

গায়ের পোশাক ধুয়ে এনেছে সব, সেগুলো দড়িতে মেলে দিল। তারপর মেঝেয় উবু হয়ে বসে বলল, আপনাকে এত রাতে বড় কষ্ট দিলাম।

শাসন চা করছিল। গরম চায়ের গেলাস তার হাতে দিয়ে বলল, মনে হইতেছে আপনার কষ্ট অনেক বেশী।

হ্যাঁ শাসনদাদা। আমি আজ মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। কাল পুলিশ আসবে। আজ রাতটুকুই যা আমার হাতে আছে।

পুলিশ আসিবে? আপনি কী করিয়াছেন মহাশয়?

আমার ফাঁসি হবে শাসনদাদা।

চা-টুকু পান করুন। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিতে থাকুন। গ্রামে নিশুত রাত্রিতে কথা অনেক দূর হইতে শুনা যায়।

যদু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। চা-টুকু তার বেশ ভাল লাগল। কথাবার্তা গুছিয়ে বলার মতো অবস্থা নয়। ভারী এলোমেলো হয়ে গেল সব কথা। কিন্তু সে বলতে পারল। সবই বলে দিল। কিছু গোপন করল না।

শাসন তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে ছিল। বলল, মৃগাঙ্কবাবু যে মরিয়াছেন তাহা আপনি নিশ্চিত জানেন?

যদু মাথা নাড়ল, না, তার মরারই কথা। আমার মাথার ঠিক ছিল না। মেরে বসলুম। দশ বছর বাবা বলে ডেকেছি।

ইহা ভাবপ্রবণতার সময় নহে। আগে জানা দরকার লোকটি মারা গিয়াছে কিনা।

না মরলেও কী? চুরি যাবে কোথায়? আমি যে নিজের কবর নিজে খুঁড়েছি।

শাসন একটু চুপ করে থেকে বলল, মানুষ কখন যে কোন প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কী করিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। আজ রাত্রিতে আপনার নিদ্রা হইবে কি?

যদু মাথা নেড়ে বলল, না। আজ ঘুমের আশা নেই। মাথাটা বড্ড গরম।

আপনার বাড়িতে কাহাকেও খবর দিব কি?

না। ওরা কিছু জানে না, এই ভাল। জানলে লজ্জার ব্যাপার হবে।

কিন্তু পুলিশ যদি আসে তাহা হইলে উহাদের শান্তি থাকিবে না। আপনার সন্ধান পাওয়ার জন্য পুলিশ উহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবে এবং আরও কিছু করিতে পারে।

যদু বলল, জানি। আমার কর্মফল ওদেরও ভোগ করতে হবে। তা করুক একটু। আপনি কি আমাকে ধরিয়ে দেবেন শাসনদাদা? এখনও আমার কাছে পঁয়ত্রিশ হাজারেরও কিছু বেশী টাকা আছে। ওই বালিশের মধ্যে। তা দিয়ে বাঁচা যাবে না?

আপনি উৎকোচ প্রদানের কথা বলিতেছেন কি?

তাছাড়া আর কিসে হবে?

প্রথমেই উৎকোচের পন্থা গ্রহণ সদ্‌বিবেচনার কাজ হইবে না। বিশেষত মৃগাঙ্কবাবুরা ধনী। তাহারা জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। আপনার সম্বল সামান্য। উহাতে হইবে না।

টাকাটা কম হল?

মহাশয়, টাকার পরিমাণ আপেক্ষিক। কাহারও কাছে পাঁচ টাকাই অনেক, কাহারও পাঁচ লক্ষও কিছুই নহে।

।। এগারো ।।

মৃগাঙ্কর যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন তিনি ধীরে ধীরে নিজেই উঠে বসলেন। কী হয়েছিল তা তাঁর মনে পড়ল না। মাথার পিছনে প্রচণ্ড ব্যথা। হাত দিয়ে দেখলেন, ভেজা এবং চটচটে। হাতটা সামনে এনে দেখলেন, রক্ত। কিছুক্ষণ অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকলেন। কিছুই মনে পড়ল না। তিনি কি পড়ে গিয়েছিলেন? স্ট্রোক নয় তো? টেলিফোনের রিসিভারটা ঝুলছে কেন? তিনি কি কাউকে ফোন করেছিলেন? কাকে? টেবিলের কোণায় একটু রক্ত লেগে আছে নাকি? তিনি যখন পড়ে যান তখন টেবিলের কানায় কি মাথাটা লেগেছিল?

মৃগাঙ্ক একটা চেয়ারে উঠে বসে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। কাকে ডাকবেন বুঝতে পারলেন না। এ বাড়িতে কে আছে বা কে থাকে তাও তাঁর মনে পড়ল না। কিন্তু কাউকে ডাকা দরকার। ক্ষতস্থানটা বেশ ফুলেছে। থেঁতলে গেছে।

হঠাৎ তাঁর একটি কিশোরী প্রতিম মুখ মনে পড়ে গেল। বেশ কাটাকাটা মুখশ্রী, একটু শ্যামলা, রোগা। মেয়েটা খুব হাসে। সিঁথি ভরে সিঁদুর পরে। এ মেয়েটাকে তিনি খুব চেনেন।

ভীষণ চোনেন। মেয়েটা ভীষণ হাসে। কথায় কথায় ঠোঁট ফোলায়। নামটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। এ মেয়েটি রোজ রাতে তাঁর বুক ঘেঁষে শোয়। মেয়েটি রোজ তাঁর জন্য ভাত রাঁধে। তাঁর দরিদ্র সংসারে মেয়েটি অনেক দায়ভার বহন করে।

কে মেয়েটি!

আঃ, একটা কাতরতার শব্দ করলেন মৃগাঙ্ক। এটা কার বাড়ি তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি এখানে কেন এসেছেন? ভবানীপুরে তাঁর এঁদো বাড়ির ছোট্ট বাসা আছে না?

মৃগাঙ্ক উঠবার চেষ্টা করলেন। তিনবারের চেষ্টায় উঠলেন। বাথরুম খুঁজে পেতে তাঁর অসুবিধে হল না। তিনি ক্ষতস্থানে জল দিলেন। একটা তরল অ্যান্টিসেপটিকের শিশি থেকে খানিকটা হাতে ঢেলে লাগিয়ে দিলেন ক্ষতস্থানে। বেসিন থেকেই অনেকটা জল আঁজলা করে খেলেন।

কিশোরীর নামটা তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কল্পনা, তাঁর বউ।

মৃগাঙ্ক ডাকলেন, কল্পনা! এই কল্পনা!

মলের শব্দ হল না? কল্পনা মল পরে। কেন পরে ও-ই জানে। কল্পনা আসছে।

মৃগাঙ্ক বেসিন থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কল্পনা, এটা কার বাড়ি বলো তো। আমরা কি এখানে বেড়াতে এসেছি?

কেউ কোনও জবাব দিল না, সামনেও এল না, মলের শব্দটা কি শোওয়ার ঘরের দিকে চলে গেল?

কল্পনা! ফের লুকোচুরি খেলা হচ্ছে আমার সঙ্গে! দেখছ না, আমি পড়ে গিয়েছিলাম! মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে যে!

না, কল্পনা আর সাড়া দিল না। তাঁর বউটা বড্ড দুষ্টু। সব সময়ে তাঁর সঙ্গে খুনসুটি করবেই। কখনো পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝবে না।

মৃগাঙ্ক খানিকটা স্খলিত পায়ে বাইরের ঘরটায় এসে বসলেন। চোখ বুজে বললেন, লক্ষ্মীটি, একবার এদিকে এসো। অনেকটা ব্লিডিং হয়েছে। কাছে এসে একটু দেখ।

কল্পনা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে দেখছে। কাছে আসছে না। মৃগাঙ্কর মনে পড়ল, কল্পনা রক্ত ভয় পায়। রক্ত দেখলে সিঁটিয়ে যায়।

শোওয়ার ঘরে মলের একটা ঝিলিক শব্দ হল নাকি?

ফ্রিজটা নজরে পড়ল মৃগাঙ্কর। অনেক বাড়িতে ফ্রিজে মদ থাকে। এখানেও আছে কি? একটু ব্যাণ্ডি খেয়ে নিলে কেমন হয়? তিনি শুনেছেন শক-এ ব্যাণ্ডি খুব উপকারী।

টলতে টলতে গিয়ে তিনি ফ্রিজটা খুললেন। কাদের ফ্রিজ কে জানে বাবা। কিছু বলবে না তো! এ অবস্থায় অবশ্য না বলাই স্বাভাবিক।

মৃগাঙ্ক ব্র্যান্ডির বোতলটা খুলে গলায় খানিকটা ঢেলে দিলেন। শরীরটা গরম হয়ে গেল। আরও একটু খেয়ে কাশলেন। তৃতীয় বার আরও খানিকটা খেয়ে তিনি চেয়ারে বসে হাঁফাতে লাগলেন।

কল্পনা, চলো বাড়ি যাই। রাত হয়েছে।

মৃগাঙ্ক দেয়ালঘড়িতে সময় দেখলেন, দশটা।

একটা পোড়া গন্ধ আসছে না?

কল্পনা, দেখ তো কী পুড়ছে উনুনে!

না, ভুল। এ তো তাঁর নিজের বাড়ি নয়। কল্পনা কেন দেখবে? মৃগাঙ্ক আবার উঠলেন। রান্নাঘরের দরজায় এসে দেখলেন, একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি গ্যাসের ওপর লাল হয়ে পুড়ে যাচ্ছে।

গ্যাস উনুন কী করে নেবাতে হয় তা মৃগাঙ্ক জানেন না। তিনি অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখলেন। তবে উনুনে চাবি রয়েছে। তিনি গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিলেন। আগুন নিবে গেল।

কল্পনা, রাত হচ্ছে, চলো। কী যে করে মেয়েটা।

মৃগাঙ্ক শোওয়ার ঘরে এলেন। নাঃ, কেউ কোথাও নেই। বারান্দায় দেখলেন। নেই। সব ঘর ঘুরলেন। নেই। ফের শোওয়ার ঘরে এলেন। আলনার পেছনে, খাটের তলায়, আলমারির কোণে সর্বত্র কল্পনা লুকোয়। কোথাও নেই আজ। শুধু ওর একটা মল পড়ে আছে খাটের পাশে। তিনি মলটা কুড়িয়ে নিয়ে হাসলেন। কাছেই আছে নিশ্চয়ই। হুটোপাটি করে লুকোতে গিয়ে একট মল পড়ে গেছে পা থেকে।

ফের ডাকতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখলেন, ঘরে একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকে চাই?

লোকটা জবাব দিল না। নিশ্চয়ই গৃহকর্তা। মৃগাঙ্ক একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, আমরা এখনই চলে যাবো। রাত হয়েছে। কল্পনাকে একটু ডেকে দেবেন? আমার বউ একটু পাগলী আছে। কোথায় লুকিয়ে রয়েছে খুঁজে পাচ্ছি না।

ঠিক এই সময়ে কলিং বেল বাজল। মৃগাঙ্ক একটু চমকে উঠলেন। রি-রি-রি-রিং।

তিনি বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বেল-এর শব্দে মাথাটা চিড়িক দিয়ে উঠল। অসহ্য। একটা দুর্বল নার্ভে শব্দটা এমনভাবে লাগছে এসে যে, শরীর ঝনঝন করে উঠছে। মৃগাঙ্ক যন্ত্রণায় চোখ বুজলেন।

চোখ খুলেই বুড়ো লোকটাকে চিনতে পারলেন তিনি। ড্রেসিং টেবিলের মস্ত আয়নায় তাঁর প্রতিবিম্ব। ঝম করে মাটিতে পা পড়ল তাঁর। সব মনে পড়ল। কল্পনা! সে তো মারা গেছে!

মলটা হাতে নিয়েই দরজা খুলে একতলায় নামলেন তিনি। দরজা খুললেন। সুমিত।

যদুদা কোথায় বাবা? তুমি দরজা খুললে যে!

ওঃ, সে একটু দেশে গেছে।

কেন?

ওর বউয়ের ক্যানসার। জানিস তো!

বাড়াবাড়ি নাকি?

বোধহয়।

সুমিত ওপরে উঠতে উঠতে বলল, অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ পাচ্ছি কেন বলো তো! এ কী! তোমার মাথায় রক্ত কেন?

ওঃ, আজ খুব জোর বেঁচে গেছি। বাথরুমে পা পিছলে-

সর্বনাশ! ডাক্তারকে খবর দাওনি?

দরকার নেই। তেমন কিছু নয়।

দাঁড়াও। ইট নিডস্ ড্রেসিং।

সুমিত ডাক্তারকে ফোন করল। মৃগাঙ্ককে বলল, তুমি শুয়ে থাকো।

না না। ইটস্ অলরাইট। ডাক্তারেরও দরকার ছিল না।

ডাক্তার আধঘন্টা বাদে এলেন। ক্ষতটা দেখে বললেন, খুব বেঁচে গেছেন। ইনজুরি সুপারফিশিয়াল। কিন্তু টীপ হলে নার্সিং হোমে যেতে হত।

মৃগাঙ্ক মৃদুস্বরে বললেন, হ্যাঁ, লোকটার হাতে তেমন জোর ছিল না। থাকবে কী করে? বাবা বলে ডাকত যে!

কিছু বললেন?

না তো!

ক্ষতটা বেঁধে ডাক্তার একটা টেটভ্যাক আর একটা সেডেটিভ ইনজেকশন দিয়ে বললেন, আজ রাতটা একটু ঘুমোন। কাল সকালে একবার ফোন করবেন। মনে হয় খুব একটা কিছু হয়নি। দরকার হলে কয়েকটা পেনিসিলিন দেবো।

নো নীড।

মৃগাঙ্ক চোখ বুজলেন। হাতে মলটা এখনো ধরা। একটু নাড়লেন। শব্দ হল ঝিনঝিন।

সুমিত বাবার দিকে চেয়ে বলল, তোমার হাতে ওটা কী?

মল। মল চিনিস?

শুনেছি। ওটা পেলে কোথায়?

তোর মা অনেক আগে পরত। ঘরে পড়ে ছিল।

মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে বুঝি?

না পড়ে উপায় ছিল না। ইন ফ্যাক্ট শী ওয়াজ হিয়ার এ লিটল হোয়াইল এগো।

সুমিত হাসল, ঘুমোও। স্মৃতিচারণ বেশী ভাল নয়।

তোকে কে খেতে দেবে?

নিজেই নিয়ে নেবো। খিদে অবশ্য নেই। পার্টি ছিল।

মৃগাঙ্কর আবার গোলমাল হল। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। আবছায়া হয়ে আছে জগৎ। বললেন, তোর মাকে বল। দেবে।

মা কোথায়? তুমি ঘুমোও।

কল্পনা তো আছে। কোথায় লুকিয়েছে খুঁজে দেখ। আছে কোথাও।

আচ্ছা দেখছি।

মৃগাঙ্ক ঘুমিয়ে পড়লেন।...

বেশ বেলায় তাঁর ঘুম ভাঙল। শরীর ভীষণ দুর্বল। মাথায় তীব্র ব্যথা আর ভার। খানিকক্ষণ অর্থহীন চোখে চেয়ে শুয়ে রইলেন। উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম ভেঙেই তাঁর যদুর কথা মনে পড়ল আজ। কী দিয়ে মেরেছিল যদু? আরও জোরে মারতে পারত। মারার কথাই। পারল না কেন? ইদানীং ভারী রোগা হয়ে গিয়েছিল যদু। আর ভারী উদভ্রান্ত। সেই জন্যই বোধহয় পারেনি।

বিশু এসে দরজায় দাঁড়াল। মুখটা গম্ভীর।

সাহেব, চা দেবো?

তুই যদুকে কাল বেরিয়ে যেতে দেখেছিস?

দেখেছি। বগলে বালিশ ছিল আর হাতে স্যুটকেস।

কোথায় গেল?

দেশে। বলল, আপনি ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

মৃগাঙ্ক একটু চেয়ে থেকে বললেন, তুই ওর গাঁ চিনিস?

না।

ঠিক আছে, চা নিয়ে আয়।

মৃগাঙ্ক চা খেয়ে উঠলেন। শরীরটা দুর্বল বটে, কিন্তু ঠিক আছে। তেমন টলছে না। হাত-পায়ে কাঁপুনি নেই। মাথাও পরিষ্কার।

সুমিত অন্য বাথরুম থেকে সদ্যোস্নাত বেরিয়ে এসেই বলল, বাবা, কেমন আছ?

চমৎকার। ফাইন।

সুমিত ক্ষতটার ব্যাণ্ডেজ পরীক্ষা করে দেখল। বলল, রেস্ট নাও। ডাক্তার বলল ভয় নেই।

ভয়ের কী? সামান্য ব্যাপার।

এ সময়ে যদুদা থাকলে ভাল হত।

হুঁ, তুই অফিসে যা। আমার জন্য কামাই করিস না।

সুমিত ব্রেকফাস্ট খেয়ে চলে গেল। মৃগাঙ্ক খানিকক্ষণ বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়লেন। মন দিতে পারলেন না। যদু বারান্দায় ওই কোণে একদিন একটা বালিশ রোদে দিয়েছিল। রোদটা আবার সেখানেই এসে পড়েছে।

ডাক্তার এল। নাড়ী-টাড়ী দেখে বলল, বাঃ, খুব ভাল। রিকভার করেছেন অনেকটা। ইনজুরিটা কী করে হল?

বাথরুমে পড়ে গিয়ে।

পড়লেন কী করে?

বুঝতে পারছি না।

তাহলে প্রেসারটা দেখতে হচ্ছে।

প্রেসার দেখে ডাক্তার বললেন, নাথিং টু ওরি অ্যাবাউট। তবে সাবধানে থাকবেন। বয়স হলে বাথরুম সম্পর্কে সাবধান হতে হয়। বেশীরভাগ ফ্যাটালিটি ওখানেই ঘটে।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর মৃগাঙ্ক নিজের মতো করে নিজেকে আর একবার পরীক্ষা করলেন। তাঁর বয়স ষাটের ওপর। কিন্তু বয়সটা তো বড় কথা নয়। আসলে তিনি কেমন আছেন তার ওপরেই বয়সটাও নির্ভর করছে। উঠে দাঁড়িয়ে নানাভাবে শরীরটাকে বাঁকালেন, একটু লাফালেন, ঘরময় দ্রুত পায়ে হেঁটে দেখলেন কিছুক্ষণ। মাথাটা ভার আর টনটনে ব্যথা ছাড়া তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। শরীরটা কিছু দুর্বল। কী দিয়ে মেরেছিল যদু? অস্ত্রটা কোথাও খুঁজে পেলেন না।

ফোন তুলে ডায়াল করলেন।

দীনেশ!

কী খবর?

কালোবাবা কোথায়?

আজই চলে গেল। রাখা গেল না। কেন বল তো!

কোথায় গেছে?

তা তো বলে যায়নি। ওর বাড়িঘর নেই। ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তোর হঠাৎ কী হল বল তো!

বিপদ।

তার মানে?

বিপদ, তবে কেটে গেছে।

দীনেশ একটু চুপ করে থেকে বলে, কিরকম বিপদ? মস্তিষ্কে আঘাত?

হ্যাঁ। কালোবাবা তাই বলেছিল বুঝি?
লোকটার ভিতরে মাল ছিল রে। তোকে তো বলেইছি।
তোকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে।
চোট কতটা?
খুব বেশী নয়। কিন্তু সামান্য এদিক ওদিক হলেই হয়ে গিয়েছিল।
দীনেশের গলায় যথেষ্ট আহ্লাদ ফুটে উঠল, বাঃ! চমৎকার! এরকমই হওয়ার কথা ছিল।
আমার বাঁচার কথা ছিল কি?
ফিফটি ফিফটি। কালোবাবা বলেছিল, যদি বেঁচে যায় তো কপাল। তোর কপাল বরাবরই ভাল। চোটটা পেলি কী করে?
সেটা বলেনি বুঝি?
নাঃ। ওরা অত ভেঙে বলে না।
সে অনেক কথা। পরে বলব। তোর সেই আত্মীয় ছেলেটি-মনীশ না কী যেন নাম।
মনীশ! কেন, তাকে কী দরকার?
তাকেই দরকার। সে কি আমার হয়ে একবার তোদের গাঁয়ে যেতে পারবে?
বলে দেখতে পারি। কিন্তু কেন?
দরকার আছে।
আচ্ছা গ্যাঁড়াকল তো! ভেঙে না বললে ওকে কী বলব? বেচারা চোরের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে এসেছে। আবার ডাকাতরাও নাকি ওত পেতে আছে ওর জন্য।
তাহলে থাক।
যা ভাবছিস তা নয়। ছোকরা প্রচণ্ড ডাকাবুকো। ওই একটাই গুণ। ওই গাঁয়ে আবার ফিরে যাওয়ার খুব ইচ্ছেও দেখছি। কিন্তু তুই তো যদুকে পাঠাতে পারিস। যদুর আর আমার একই গাঁ।
যদুর জন্যই তো পাঠাতে চাইছি।
যদু কি দেশে গেছে?
তাই মনে হচ্ছে।
ভেঙে বল।
অত ভেঙে বলা যাবে না।
চুরি করে পালিয়েছে তো! পুলিশে খবর দে, গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনবে।
না, পুলিশ নয়। মনীশ গিয়ে ওকে বলবে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। আর বলবে ভয় নেই।
যদুকে কি তুই রেখে দিতে চাস?
এখনো ঠিক করিনি। তবে শুনেছি ওর বউয়ের ক্যানসার।
তাতে কী হল?
তোর বউ নেই, বুঝবি না।
লে হালুয়া। এর মধ্যে আবার বউ নিয়ে টানাটানি কেন?
মৃগাঙ্কর বাঁ হাতে মলটা এখনো ধরা। ঝিন ঝিন করে একটা বাজালেন। তারপর বললেন, তুই বুঝবি না রে গাড়ল। কিন্তু মনীশ যদি আমার উপকারটা করে তাহলে বড় ভাল হয়।
করবে। চিন্তা করিস না।
এরপর মৃগাঙ্ক সারাদিন একা। বাঁ হাতে আনমনে ধরা কল্পনার একখানা মল। মাঝে মাঝে বাজাচ্ছেন। আর এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে এঘর ক্রমান্বয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আচমকা দাঁড়িয়ে উৎকীর্ণ হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে ডেকে ওঠেন, কল্পনা! কল্পনা!
ভারী ছেলেমানুষী হচ্ছে। তবু আজ ফাঁকা বাড়িতে একা একা সারাদিন ছেলেমানুষী করতে লাগলেন মৃগাঙ্ক।
দুপুরে একটা ফোন এল। ভীতু গলা।
আমি দীনেশ বাবুর ভাইপো মনীশ।
ওঃ মনীশ!
কাকা আমাকে বলেছেন। আমি কবে গেলে আপনার সুবিধে হয়?
আজই। পারবে?
পারব। আপনি ভাববেন না।

তুমি কি যদুর বাড়িতে ছিলে?

কয়েকদিন। একটা চোরের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে উণ্ডেড হই। যদুবাবুর ছেলে আমার কাছে কাজ করত। সেই নিয়ে যায় ওদের বাড়িতে।

যদুর বউয়ের কি ক্যানসার?

ডাক্তাররা সেরকমই সন্দেহ করেছেন। তবে গাঁয়ের ডাক্তারদের কথা কতটা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত তা বুঝতে পারছি না।

আমার সন্দেহ যদু দেশেই গেছে। ওর আর যাওয়ার জায়গা নেই। তুমি যদি ওর দেখা পাও তো বোলো, আমার কিছু হয়নি। পুলিশে খবরও দিইনি। ও যেন চলে আসে।

যদুবাবু কি কিছু করেছে?

করেছে। কিন্তু ডিটেলস্ জানবার দরকার নেই তোমার। ওকে আমি ক্ষমা করেছি। ওকে বোলো।

বলব।

আর একটা কথাও বলতে পারো। বোলো, টাকা ফেরত চাইব না।

বলব।

এসব কি তোমার কাছে সাংকেতিক কথা বলে মনে হচ্ছে?

না। বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারছো মনীশ?

বুঝতে পারছি ও আপনাকে কোনও ফিজিক্যাল অ্যাটাক করেছিল। তারপর টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়।

তুমি খুব বুদ্ধিমান।

তবু আপনি ওকে ক্ষমা করতে চাইছেন।

ঠিক। আসলে ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না।

বুঝতে পারছি।

তোমার যা খরচ হয় তা আমি দেবো।

দরকার নেই। ওই গ্রামে আমি নিজের গরজেরই যাই।

ওখানে তুমি কেন যাও?

আমার একটা ব্যবসা আছে।

আচ্ছা।

ফোন রেখে মৃগাঙ্ক আবার ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। টু দিলেন। লুকিয়ে রইলেন। কল্পনা কি তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবে? হাতের মলটা বাজিয়ে সঙ্কেত দিলেন। পারল না। পরের বার খাটের তলায় লুকোলেন মৃগাঙ্ক। টু দিলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে কখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন খেয়াল নেই। কলিং বেল-এর শব্দে যখন ঘুম ভাঙল তখন অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর চোখ জলে ভেসে গেছে; ঘুমের মধ্যেই কেঁদেছেন খুব। বুকে ব্যথা হয়ে আছে।

মৃগাঙ্ক উঠে চোখ মুছে দরজা খুলে দেখলেন, বিশু।

কী রে?

আজ্ঞে আপনার লাঞ্চ সার্ভ করতে এসেছি।

আয়।

মৃগাঙ্ক একটু জ্বর বোধ করছেন। তেমন খিদে নেই। তবু সামান্য একটু খেলেন। সুমিত ফোন করে তাঁর খবর নিল একবার। তারপর আবার একটু ঘুমোলেন। বিকেলে সুমিত চলে এল তাড়াতাড়ি, বাবা, কেমন আছো?

ভেরি গুড। ফিট।

তোমার মুখচোখ ভার দেখাচ্ছে। কেঁদেছো নাকি?

মৃগাঙ্ক একটু হাসলেন, কেঁদে থাকলে ভাল রে। খুব ভাল।

।। বারো ।।

মনীশ যখন পৌঁছলো তখন বেশ রাত। সারা পথ সে সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল। হাতে বড়বাজার থেকে কেনা একটা মজবুত লাঠি। নাল পরানো। অন্য হাতে টর্চ। কাঁধে মস্ত একটা নাইলনের ব্যাগে তার জিনিসপত্র।

মনুদের উঠোনে ঢুকে সে ডাকল, মন্টু! ও মন্টু!

যে ঘরে মনীশ ছিল সেই ঘরের দরজা খুলে মনু বেরিয়ে এল। মুখে একরাশ বিস্ময় এবং

চোখে আতঙ্ক হ্যারিকেনের আলোতেও দেখা গেল, আপনি! কী সর্বনাশ!
সর্বনাশের কী?
শীগগীর ঘরে আসুন। কে কোথায় দেখে ফেলবে!
অত ভয় পেও না।
না না, শীগগীর আসুন। আমাদের ভীষণ বিপদ।
মনীশ ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিল মনু। বিছানায় বইপত্র ছড়ানো।
তুমি পড়ছিলে?
না। অন্যমনস্ক থাকার জন্য বই খুলে বসে ছিলুম। মন ছিল না।
কী হয়েছে?
মনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কত কী হয়ে গেল!
মনীশ চেয়ারে বসে বলল, একটা খবর দিতে পারো?
কী খবর?
মনীশ বলবে কিনা ভাবছিল। মনুর চোখের কোলে বিস্তর কান্নার চিহ্ন। মেয়েটা কেঁদেছে আর কেঁদেছে। শুকনোও দেখাচ্ছে। হয়তো খায়নি আজ।
মনীশ গলাটা যতদূর সম্ভব কোমল করে বলল, আমি ভাল খবর নিয়ে এসেছি। ভয় পেও না। তোমার বাবা কোথায়?
এ কথায় মনুর মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গেল। ঠোঁট কেঁপে উঠল। আঁচলে চোখ চেপে ধরে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।
কাঁদছো কেন?
আপনার সঙ্গে কি পুলিশ এসেছে?
পুলিশ! না তো!
পুলিশ তো আসবে। বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে। ফাঁসি হবে।
তোমার বাবা কোথায়?
মনু খানিকক্ষণ কেঁদে ধীরে মুখ তুলল, চোখ মুছল। তারপর বলল, লুকিয়ে কী হবে? বাবা ভুল বকছে, গায়ে তিনচার ডিগ্রি জ্বর, কিছু দাঁতে কাটতে পারছে না, বমি হয়ে যাচ্ছে।
ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।
আপনি কেন এলেন? আপনার প্রাণের ভয় নেই?
না নেই। ঝন্টুরা কি ছুরি ছোরা নিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?
মনু মাথা নেড়ে বলল, না। ওরা কেউ গাঁয়ে নেই।
কোথায় গেছে?
হরিহরদাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। দাদার খবর জানি না। তবে গাঁয়ে নেই।
তোমার বাবা কোথায় আছে বললে না?
শাসনবাবুর বাসায়। কিছুতেই আনা গেল না। মা গিয়ে রোগা শরীরে বাবার সেবা করছে।
শাসনবাবুর বাসায় কেন?
মনু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের কাঁদতে লাগল। ধরা গলায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, সব কি আপনার শোনা দরকার? আমার বাবা অনেক কাণ্ড করে এসেছে।
মনীশ মৃদু স্বরে বলল, ওঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। জরুরী কথা। মৃগাঙ্কবাবুই আমাকে পাঠিয়েছেন। কথাটা জরুরী।
মনু চমকে উঠল, কে বললেন।
মৃগাঙ্ক বাবু। যার বাড়িতে তোমার বাবা কাজ করেন।
মনু কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল, তিনি বেঁচে আছেন?
মনীশ মৃদু হেসে বলল, ভালই আছেন। আজ দুপুরে ফোনে কথা হল ওঁর সঙ্গে।
যাঃ। হতেই পারে না।
কেন হতে পারে না?
বাবা যে ওঁকে খুন করে এসেছে!
চেষ্টা করলেও খুন উনি হননি।
মনু হঠাৎ ঢেউ হয়ে উঠে এসে মনীশের ওপর পড়ল। দুহাতে খামচে ধরল মনীশের দুই হাত, মিথ্যে কথা বলছেন না তো! ঠিক তো। উনি সত্যি মরেননি তো!
রূপটান নয়, সেন্ট নয়, কিশোরী শরীরের এক আশ্চর্য মোহময় সুঘ্রাণ প্রায় সম্মোহিত করে ফেলে মনীশকে। সে কি এই মেয়েটিকে ভালবাসে? সে কি এই মেয়েটির জন্যই বিপদের ঝুঁকি

নিয়ে ফিরে আসেনি?

একটু অস্ফুট গলায় মনীশ বলল, মিথ্যে নয়। মিথ্যে বলার জন্য কেউ এত দূর ছুটে আসে নাকি?

মনু তবু অবিশ্বাস নিয়ে মনীশের বুক ঘেঁষে হাত খামচে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে লণ্ঠনতা তুলে নিয়ে বলল, চুরির জন্য বাবার যদি জেল হয় হোক। কিন্তু খুনের জন্য ফাঁসি হলে সারাজীবন আমাদের মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। মা আর আমি কত কাঁদছি জানেন?

আর কেঁদো না। মৃগাঙ্কবাবু চুরির দায়েও তোমার বাবাকে ধরাবেন না।

কী যে বলছেন সব আজ! আপনি কি দেবদূত?

না। দেবদূত বললে তো মৃগাঙ্ক বাবুকেই বলতে হয়।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে মনু বলল, চলুন আপনাকে নিয়ে যাই।

পথটা প্রায় উড়ে পার হল মনু। পিছনে মনীশ।

শাসনের বুদ্ধি ক্ষুরধার। দরজা খোলার আগে জানালা দিয়ে দেখে নিল। মনীশকে দেখে একটু ভয়-খাওয়া গলায় বলল, মহাশয়, আপনি এই অসময়ে?

দরকার আছে শাসন বাবু? ভাল খবর এনেছি।

শাসন দরজা খুলে বলল, আসিতে আজ্ঞা হউক। সেই দিনের সেই ঘটনার পর আপনার উপর আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছে। আপনি তেজস্বী লোক। তবে অবিমৃশ্যকারী। আসিতে আজ্ঞা হউক।

যদু বাবু কোথায়?

কোনো সংবাদ আছে কি?

আছে। মৃগাঙ্ক বাবু মারা যাননি। ভাল আছেন। তিনিই আমাকে পাঠালেন।

ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

শুধু তাই নয়, ক্ষমার কথাও বলে পাঠিয়েছেন।

মহাশয়, কলিযুগ তো এখনও শেষ হয় নাই!

হয়তো হয়েছে, কে জানে।

আসুন, যদু বাবুকে ভিতরের একটি ঘরে রাখিয়াছি।

ভিতরের ঘরে যদু ঘোর জ্বরের মধ্যে পড়ে আছে। খাটে তার পাশেই ফ্যাকাসে মুখে কুসুম। এই দরিদ্র পরিবারটির সব আশা ভরসা শায়িত ওই মানুষটা। কুসুম অপলক চোখে চেয়ে ছিল।

যদু অস্ফুট স্বরে কী একটা বলে মাথাটা ঝাঁকাল। আবার নিথর হয়ে গেল।

মনীশ শঙ্কিত চোখে যদুর অবস্থা দেখে বলল, এ অবস্থায় কিছু ওর কানে যাবে?

না মহাশয়, তবে এই বিকার অবস্থা সাময়িক। হয়তো প্রাতঃকালে জ্ঞান ফিরিবে। আপনি আজ রাত্রিটা অবস্থান করুন।

করব।

মনু দাঁতে ঠোঁট কামড়াল, মা, আমি গিয়ে রান্না করি? মনীশ বাবু যে রাতে খাবেন!

কুসুম এখনও খবরটা জানে না। ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে বলল, যা।

মনু গিয়ে মায়ের পাশে বসে কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলল। কুসুম দুঃস্বপ্ন ভাঙা চোখে মনীশের দিকে চেয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল, সত্যি বাবা?

সত্যি। উনিই পাঠালেন।

কী বললেন?

ওঁকে দেখা করতে বলেছেন। ভয় পাবেন না, মৃগাঙ্ক বাবুর কিছু হয়নি।

কিন্তু মনুর বাবা যা বলছে-

মৃগাঙ্ক বাবু আপনার অসুখের কথাও জিজ্ঞেস করছিলেন।

আমার অসুখ! আমার অসুখের কথা কেন?

তা জানি না। মানুষের মন কখন কিরকম হয় কে জানে!

কুসুম কেমন যেন গা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে বসে রইল। তারপর হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে।

আমরা যাই মা? মনীশ বাবুর খিদে পেয়েছে।

যাও। সকলের জন্যই রান্না কোরো।

মনু নিঃসঙ্কোচে মনীশের হাত ধরে টেনে বলল, চলুন, অনেক রাত হয়েছে। বেশী কিছু হবে না কিন্তু। আলু আর ওলকপির ঝোল আর ভাত। বাবার জন্য আমাদের আজ রান্নাই হয়নি। কেউ খাইনি সারাদিন। মন্টু আর পল্টু তো খিদে চেপে ঘুমিয়ে পড়ল।